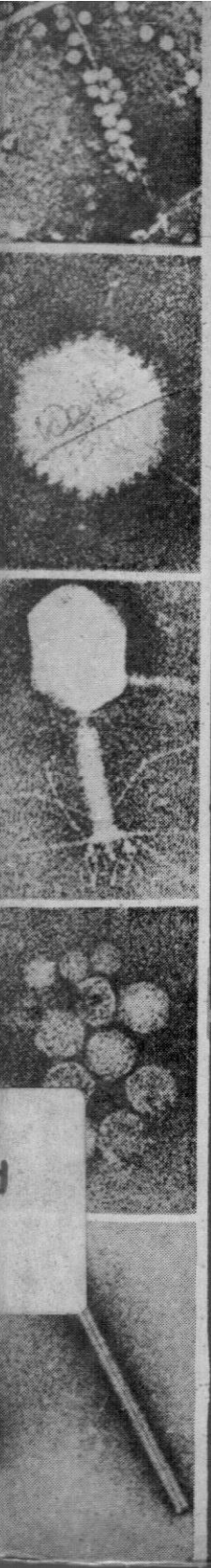

ভাইরাসতত্ত্ব পরিচয়

আহমেদ মাতীন

ভাইরাসতত্ত্ব পরিচয়

BANGDOC Library Dhaka

আহমেদ মতীন
সহযোগী অধ্যাপক
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANDOC Library
Accession No. 17876
Date 10.6.04

ভাইরাসতত্ত্ব পরিচয়

(জীববিজ্ঞান : ভাইরাসের গঠন ও আচরণ সম্পর্কিত বিবরণ)

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭/জুন ২০০০

বাএ ৩৯৬১
(১৯৯৯–২০০০ : পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ১২)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২৭৯

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
শা. র. শামীম

মূল্য
একশত টাকা

VIRUSTATTAYA PARICHOY (An Introduction to Virology) by Ahmed Matin. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First edition : June 2000. Price : Taka 100.00 only.

ISBN 984-07-3970-0

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় দুলাভাই
জনাব মমতাজউদ্দীন আহাম্মদ
বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী এবং বিজ্ঞানমনস্ক
এক বিরল ব্যক্তিত্বরূপে
আমার গড়ে ওঠার পেছনে যিনি ছিলেন
আশৈশব অনুপ্রেরণা ও চালিকাশক্তিস্বরূপ
তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে

প্রাককথন

[illegible]র মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই. এ বিষয়টি নিয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ [illegible] হয়েছে। বলা যায়, এটি বহুলাংশে নিষ্পন্ন একটি বিষয়। কিন্তু তবু আমি দেখেছি, [illegible]দের শিক্ষিত সমাজেই এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে এক [illegible] তুচ্ছতাবোধে ভোগেন। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা [illegible], এঁদের মতে নিছক আবেগ ও [illegible]প্রসূত একটি অর্থহীন উদ্যোগ। নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে প্রায় কিছু না জেনেই এঁদের [illegible] বিজ্ঞ মত প্রকাশ করেন, তৃতীয় বিশ্বের একটি বা দুটি দেশের এ ভাষাটি নিয়ে [illegible] করার কিছু নেই। এরা বাঙালির জন্য মাতৃভাষা বাংলা শেখা অত্যাবশ্যক মনে [illegible] না এবং শিক্ষিত হবার জন্য কেবল ইংরেজি শেখাই অবশ্যক মনে করেন। ভাষা ও [illegible] যে বাঙালির গৌরবদীপ্ত পরিচয়, যা হারালে আমরা প্রায় নিঃস্ব ও পরিচয়হীন সে [illegible] আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমি কেবল দীনতাবোধে ক্লিষ্ট অথচ [illegible] এসব লোকের জ্ঞাতার্থে ভাষা হিসেবে পৃথিবীতে বাংলার অবস্থান সম্বন্ধে [illegible] কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

[illegible] ভাষাবিশেষজ্ঞ শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, বাংলা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম [illegible] একটি। মানুষের আবেগ, ভাবনা ও মেধার অনুশীলনজাত অর্জনসহ সকল [illegible] প্রকাশ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা বিচারেই এ ধরনের মত তিনি প্রকাশ [illegible] উপাত্তের সাহায্যেও ব্যাপারটি বিচার করে দেখা যেতে পারে। [illegible] জনসংখ্যার বিচারে বাংলার অবস্থান পঞ্চম, ইংরেজির চতুর্থ। [illegible] পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত থাকলেও দশ কোটির বেশি [illegible] এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র বারটি। বাংলায় কথা বলে প্রায় পঁচিশ কোটি লোক। [illegible] পরিশীলিত ও উৎকর্ষিত রূপ। উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এমন [illegible] নয়। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাষার সংখ্যা মাত্র সতের, বাংলা [illegible] ভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা যেমন যুক্তিযুক্ত নয়, [illegible] আমাদের পক্ষে কোনো দৈন্য বোধ পোষণ করাও অর্থহীন। বরং বেশ [illegible] পারে, 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা'।

[illegible] এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, মাতৃভাষা বাংলা শেখা ও [illegible] করা মানে ইংরেজি শেখা পরিহার করা কিংবা এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ [illegible] বিষয় দুটোকে সমার্থক মনে করেন। তাদেরই জ্ঞাতার্থে আরো [illegible] দেশেই যেমন প্রত্যেক উচ্চ শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বা [illegible] হয়, তেমনি আমি মনে করি বাংলাদেশেও প্রত্যেক উচ্চ [illegible] বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

[illegible] একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। একথা সত্যি যে, স্বাধীনতা-উত্তর [illegible] ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা [illegible] এবং যথেষ্ট নয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও

শিক্ষাবিদ সে উদ্যোগগুলোকেই ছাত্র সমাজের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে পশ্চাৎপদতার কারণ বলে প্রচার করে থাকেন। এটি একটি মারাত্মক ভ্রান্তি এবং আত্মঘাতী তৎপরতা বলে আমি মনে করি। কারণ এ প্রচারণার দ্বারা বাঙালিকে আপন মাতৃভাষার প্রতি বিরূপ করে তোলা হচ্ছে। নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান ও অনুধাবনের চেষ্টা করলেই দেখা যাবে শিক্ষার্থীদের নব্বই শতাংশেরও বেশি কেবল যে ইংরেজি জ্ঞানে দুর্বল তাই নয়, বাংলায়ও দুর্বল ; এবং উভয় ক্ষেত্রেই কারণ অভিন্ন। কারণগুলো হচ্ছে—শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক ও একাডেমিক পর্যায়ে চরম অব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত ও যুগোপযোগী পাঠ্যসূচির অভাব। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সন্ত্রাস ও দুষ্ট রাজনীতির বদ্ধ বলয় থেকে মুক্ত করে উপর্যুক্ত অনিয়মগুলো প্রতিবিধানের যথাযথ উদ্যোগ নিলেই শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকাংশ সমস্যা অদীর্ঘকালের মধ্যেই সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে দু'একটি ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরতে চাই। তবে আগেই জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলা ভাষায় আমার ব্যক্তিগত জানাশোনা উল্লেখযোগ্য নয়, তবে দীর্ঘ দিন ধরে বৈজ্ঞানিক পাঠন ও অনুশীলনের সাথে যুক্ত থেকে যে সামান্য অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তাতে আমি মনে করি বৈজ্ঞানিক ধারণা, তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে ধারণ ও প্রকাশ করার সহজ ও সাবলীল ক্ষমতা এ ভাষার রয়েছে। আমি আরো মনে করি সে ক্ষমতাকে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করা এবং সে বৃদ্ধি উপকরণকে একটি অবারিত সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়ায় পরিণত করার জন্য অন্যতম প্রয়োজন বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাব ও ব্যঞ্জনাজ্ঞাপক শব্দ সম্পদ। তাও বাংলা ভাষার রয়েছে। বাংলা ভাষার একটি অভিধান একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই দেখা যাবে, তাতে বিশেষ ভাব ও মর্ম জ্ঞাপক অব্যবহৃত ও অপ্রচলিত বিপুল শব্দ সম্ভার রয়েছে। এসব শব্দ মমির মতো অভিধানে সংরক্ষিত থাকা নিরর্থক। বিজ্ঞান ও অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়ে এসব শব্দ ব্যবহৃত হলে একদিকে যেমন ভাষা সমৃদ্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুকে একটি সহজ ও সুব্যক্ত সম্পূর্ণতা দেয়া সম্ভব হবে। এ পুস্তকে আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় আমি সে চেষ্টাই করেছি। হতে পারে আমার সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু মনে করি না, এ উদ্যোগ মূল্যহীন।

পরিশেষে, বিনীত স্বীকৃতি এই যে, 'ভাইরাসতত্ত্ব পরিচয়' যথার্থই ভাইরাসতত্ত্বের একটি পরিচিতিমূলক পুস্তক। এ তত্ত্বে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা অর্জনে যদি এ পুস্তক কিছুমাত্র সহায়ক হয় আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

বাংলা ভাষায় ভাইরাস তত্ত্বের প্রথম পুস্তক হিসেবে এবং ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণেও অনেক ত্রুটি ও ভ্রান্তি সম্ভবত এ রচনায় রয়ে গেছে। বিষয়াভিজ্ঞ পাঠকবর্গের ত্রুটি নির্দেশ ও পুস্তকের মানোন্নয়নের জন্য যে কোনো উপদেশ ও পরামর্শ গুরুত্বসহকারে ও কৃতজ্ঞতার সাথে বিবেচনা করা হবে।

সবশেষে আমার সব স্বজন সুহৃদ এবং বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট কর্মীবর্গ, এ পুস্তক রচনা ও প্রকাশ সূত্রে যাঁদের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ, তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমেদ মাতীন

সূচিপত্র

[redacted]	:	ভূমিকা	১–২০
[redacted]	:	ভাইরাস গবেষণা	২১–৪০
[redacted]	:	ভাইরাস গঠনতত্ত্ব	৪১–৮৫
[redacted]	:	ভাইরাস শ্রেণিবিধি	৮৬–১১৮
[redacted]	:	ভাইরাস অনুলিপন	১১৯–১৪৬
[redacted]	:	ভাইরাস রোগতত্ত্ব	১৪৭–১৭৪
		তথ্যপঞ্জি	১৭৫–১৭৬
		পরিশিষ্ট	১৭৭–১৮৮
		ভাইরাস নির্ঘণ্ট : প্রাণিভাইরাস	১৭৭–১৮১
		ভাইরাস নির্ঘণ্ট : উদ্ভিদভাইরাস	১৮২–১৮৬
		ভাইরাস নির্ঘণ্ট : ব্যাকটেরীয়ফাজ, সায়ানোফাজ ও মাইকোপ্লাজমা ভাইরাস	১৮৭–১৮৮
		পরিভাষা	১৮৯–২১৮
		নির্ঘণ্ট	২১৯

Dhaka

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভাইরাস : সংজ্ঞা

ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিষ। বাধ্য পরজীবী (obligate parasite) এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগাত্মক (pathogenic) অস্তিত্ব (entity) হিসেবে এ নামকরণ হওয়াই যথার্থ। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবাণুজগৎ আবিষ্কারের পূর্বে (১৬৭৬) প্রায় একশ বছর ধরে সকল অদৃশ্য রোগাত্মককেই (pathogen) ভাইরাস নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু আলোক অণুবীক্ষণ উদ্ভাবনের পর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি যখন বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিচয় নিয়ে মানুষের দৃষ্টি সীমার মধ্যে প্রবেশ করল তখনও এরা ভাইরাস নামেই অধিকতর ঘনীভূত রহস্যের আড়ালে রয়ে গেল। ব্যাকটেরিয়ারোধী ফিল্টারে এর [illegible] যোগ্যতা এবং এর কেলাসন (crystallisation), নিলম্বন (suspension), অধঃক্ষেপণ (precipitation) ও ব্যাপন (diffusion) ইত্যাদি জড়সুলভ বৈশিষ্ট্য তখন একে একটি জীবিত ধাঁধায় পরিণত করেছিল। জীবিত বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, যে ধারণার [illegible] উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কিত জ্ঞান, তা দিয়ে ভাইরাসকে বিচার করা দুষ্কর। তাই ভাইরাসের সংজ্ঞা রচনায় সর্বদাই প্রচলিত ধারণার সাথে বিরোধ দেখা দিয়েছে। [illegible] নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্তের সাথে সমন্বিত করে এর সংজ্ঞাকেও নবায়িত করতে [illegible] বারবার।

"ভাইরাস ক্ষুদ্রতম জীবিত অস্তিত্ব, কেবল জীবিত পোষক কোষের মধ্যেই এর জীবনের [illegible] প্রকাশ পায় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।" বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি অবশ্যই একটি অতি [illegible] সংজ্ঞা। ১৯৫৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী সালভেদর ই. লুরিয়া (Salvedor E. Luria) [illegible], "ভাইরাস এমন একটি উপাণুবীক্ষণিক (sub-microscopic) অস্তিত্ব, যা কেবল [illegible] জীবিত কোষে প্রবেশ করতে পারে এবং কেবল অনুরূপ কোষের মধ্যেই জনন কার্য [illegible] করতে পারে।"[১] ১৯৫৭ সালে আন্দ্রে লোফ প্রদত্ত সংজ্ঞা, ভাইরাস হচ্ছে "একটি [illegible] জীবন পর্যায় বিশিষ্ট ও একান্তভাবে অন্তঃকোষী, এমন একটি রোগাত্মক ([illegible]genic) অস্তিত্ব, (১) যা কেবল এক ধরনের নিউক্লিক এসিড ধারণ করে, (২) যার [illegible] তন্ত্র নাই ও দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় যা বিভাজিত হয় না, (৩) স্বকীয় জিনীয় দ্রব্যের [illegible] multiplication) মাধ্যমেই এর বৃদ্ধি ঘটে, এবং (৪) এর কোন লিপম্যানতন্ত্র[২]

---

1. [illegible]ses are submicroscopic entities capable of being introduced into [illegible] living cells and of reproducing inside such cells only. (S. E. Luria, [illegible]).

2. [illegible]mann system is an enzyme system for energy production.

নই।"[৩] লুরিয়া ও ডারনেল (Darnell) একই বছর একটি বিস্তৃততর সংজ্ঞা দেন, "ভাইরাস এমন এক অস্তিত্ব যার জিনোম নিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত ; এ নিউক্লিক এসিড জীবিত কোষের মধ্যে কোষেরই সংশ্লেষণ যন্ত্র ব্যবহার করে অনুলিপিত হয় এবং এমন কিছু বিশেষ ধরনের উৎপাদন করে যার সাহায্যে ভাইরাস জিনোম কোষান্তরে সঞ্চালিত হতে পারে।"[৪]

শেষোক্ত সংজ্ঞাথটিতে ভাইরাসের দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছে—প্রথমত, এর রয়েছে একটি বিশেষ অন্তঃকোষী জিনীয় উপাদান, যা পোষক কোষের জৈব রাসায়নিক প্রস্তুতি যন্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, এর রয়েছে একটি বহিঃকোষী (extracellular) অস্তিত্ব, যা পূর্বোক্ত অন্তঃকোষী জিনীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রণে তৈরি হয় এবং তা উক্ত ভাইরাস জিনোমকে নতুন পোষক কোষে সঞ্চালনের জন্য বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট মার্কিন ভাইরাসবিদ ফ্রিংকেল কনরাট (Fraenkel-Conrat) ১৯৬৯ সালে একটি দীর্ঘ ও জটিল সংজ্ঞা দেন, এতে বলা হয়েছে "ভাইরাস এক বা একাধিক DNA অথবা RNA অণুবিশিষ্ট এমন একটি কণাকার বস্তু, যা সাধারণত প্রোটিন বহিরাবরণ দিয়ে আবৃত থাকে ; এসব ভাইরাস নিউক্লিক এসিড এক পোষক কোষ থেকে অন্য পোষককোষে সঞ্চারিত হতে পারে এবং পোষক কোষের জিনীয় সংকেতের উপর নিজেদের জিনীয় সংকেত অধিস্থাপন (superimpose) পূর্বক পোষক কোষেরই এনজাইম যন্ত্র (enzymatic machinery) ব্যবহার করে নিজেদের অন্তঃকোষীভাবে (intracellularly) অনুলিপিত করতে পারে।"

সম্ভবত, এযাবত প্রাপ্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানী হ্যাহোন (Hahon) প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই আকারে সবচেয়ে ছোট, তবে বক্তব্যে গভীর অর্থবহ। এতে বলা হয়েছে "ভাইরাস ক্রোমোজোম অনুসন্ধানরত একটি খণ্ডাকার বংশগতি (heridity)।"[৫]

কোষী পরজীবী ও ভাইরাস

সামগ্রিক বিবেচনায় ভাইরাস একটি অনন্য (unique), অকোষী (acellular) জীবিত সত্তা। অন্যান্য উচ্চতর জীবতো বটেই, ব্যাকটেরিয়া, রিকেটসি, মাইকোপ্লাজমা, ক্ল্যামাইডি ছত্রাক ইত্যাদি কোষী পরজীবীর (cellular parasite) সাথেও গঠন ও জৈবিক (biological) কার্য পদ্ধতিতে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, (সারণি ১.২)।

---

৩. ... defined viruses as "strictly intracellular and potentially pathogenic entities with an infectious phase and (1) possessing only one type of nucleic acid, (2) multiplying in the form of their genetic material, (3) unable to grow and to undergo binary fission and (4) devoid of a Lipmann system" (A. Lwoff, 1957)

৪. Viruses are entities whose gnome's are elements of nucleic acid that replicate inside living cells using the cellular synthetic machinery and causing the synthesis of specialised elements that can transfer the viral gnome to other cells (Luria and Darnell, 1957).

৫. A virus is a particle of heredity in search of chromosome. (Hahon, 1964)

: কোষী পরজীবী ও অকোষী পরজীবী ভাইরাসের তুলনা

কোষী পরজীবী		ভাইরাস
কোষী অথবা আদিকোষী।	১.	অকোষী।
বাধ্য অথবা সুবিধাবাদী (facultative) পরজীবী	২.	বাধ্য (obligate) পরজীবী।
আকারে প্রায় সবই আলোক অণুবীক্ষণিক।	৩.	আকারে প্রায় সবই ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক।
নিজস্ব পোষক কোষ ছাড়াও সংবৃদ্ধি ঘটাতে পারে (ব্যতিক্রম রিকেটসি)।	৪.	কেবল জীবন্ত পোষক কোষে সংবৃদ্ধি (multiplication) ঘটাতে পারে।
একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ কোষ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব এনজাইম ধারণ করে	৫.	কেবল সংক্রমণ সূচনাকারী একটি বা কয়েকটি এনজাইম ধারণ করে, সম্পূর্ণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব এনজাইম কখনও থাকে না।
দ্রবীভূত, অধঃক্ষিপ্ত বা কেলাসিত করা যায় না।	৬.	জড় রাসায়নিক দ্রব্যের মতো দ্রবীভূত, অধঃক্ষিপ্ত ও কেলাসিত করা যায়।
রাসায়নিক গঠন জটিল।	৭.	রাসায়নিক গঠন সরল।
অন্তঃকোষী ও বহিঃকোষী পর্যায় রয়েছে	৮.	অন্তঃকোষী পর্যায় বহিঃকোষী পর্যায়ের একাংশ মাত্র।
উহার পর্যায় একটি লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি (কোষঝিল্লী) দিয়ে আবৃত। এর মধ্যে DNA, RNA এবং আরো কিছু উপাদান ও অঙ্গাণু থাকতে পারে।	৮.১.	বহিঃকোষী পর্যায় একটি প্রোটিন ক্যাপসিড দিয়ে আবৃত, এর মধ্যে DNA অথবা RNA থাকে। অন্য কোনো রাসায়নিক উপাদান বা অঙ্গাণু থাকে না।
কেবল, প্রোটিন, লিপিড, কাইটিন ইত্যাদি এক বা একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত বহিরাবরণ (কোষপ্রাচীর) থাকতে পারে।	৮.২.	অনেক প্রাণিভাইরাসের এবং কিছুসংখ্যক উদ্ভিদভাইরাসের লিপোপ্রোটিন বহিরাবরণ আছে; তবে তা কোষ প্রাচীরের অনুরূপ নয়।
অন্তঃকোষী পর্যায় সব কোষাধেয় (cell content) বিশিষ্ট এবং কোষ ঝিল্লি দ্বারা আবৃত পূর্ণাঙ্গ কোষ বা প্রটোপ্লাস্ট।	৮.৩.	অন্তঃকোষী (intracellular) পর্যায় কেবল একটি বা একাধিক নগ্ন নিউক্লিক এসিড। ক্যাপসিড ও প্রাবরণ থাকে না।
নতুন কোষের সৃষ্টি অবশ্যই পূর্বতন কোষ থেকে হয়।	৯.	নতুন ভাইরাসের সৃষ্টি পূর্বতন ভাইরাস থেকে হয় না।

	কোষী পরজীবী		ভাইরাস
৯.১.	জননকালে পোষক কোষের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে নতুন অপত্য (daughter) কোষ উৎপাদন করে।	৯.১.	এর জনন সর্বাংশে পোষক কোষের উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাসের জিনীয় নিয়ন্ত্রনে সংঘটিত হয়।
৯.২	এর সংবৃদ্ধি একটি দ্বিভাজন (binary fission) বা বিভাজন (division) প্রক্রিয়া।	৯.২.	এর সংবৃদ্ধি পোষক কোষের ভেতর ভিন্ন ভিন্নভাবে তৈরি সহাংশ (components) সমূহের সংযোজনের (assembly) ফল।

সারণি ১.২-এ আরো কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে নাম উল্লেখ পূর্বক কয়েকটি কোষী পরজীবীর সাথে ভাইরাসের সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখান হয়েছে।

সারণি ১.২ : ভাইরাস ও অন্য কয়েকটি বিশেষ পরজীবীর তুলনা

	তুলনীয় বিষয়	ব্যাকটেরিয়া	মাইকো-প্লাজমা	রিকেটসি	ক্ল্যামাইডি	ভাইরাস
১.	কৃত্রিম মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্যতা	+	+	-	-	-
২.	দ্বিভাজন	+	+	+	+	-
৩.	ছাকনযোগ্যতা (ব্যাকটেরিয়ারোধী ছাঁকন কাগজে)	+	+	+	+	-
৪.	DNA ও RNA-র যুগপৎ উপস্থিতি	+	+	+	+	-
৫.	রাইবোজোম বিশিষ্টতা	+	+	+	+	-
৬.	এন্টিবায়োটিক সুবেদিতা	+	+	+	+	-
৭.	ইন্টারফেরন সুবেদিতা	-	-	-	+	+

দ্রষ্টব্য : + = আছে, - = নাই। [F. J. Fenner এবং D. O. White অবলম্বনে]

ভাইরাসের প্রকৃতি

ভাইরাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জড় ও জীবের মাঝামাঝি এর অবস্থান। এর প্রকৃতিতে কিছু রয়েছে জড় পদার্থের অণুসুলভ বৈশিষ্ট্য এবং কিছু রয়েছে জীবিত কোষসুলভ বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই এর প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত রয়েছে দুটি মতবাদ—

ক) [illegible] (molecule theory) এবং
খ) [illegible] (organism theory)।

[illegible] প্রাণরসায়ন বিশেষজ্ঞগণ অণু মতবাদের এবং জীবাণুতাত্ত্বিকগণ [illegible]

ক) [illegible] মতবাদ—প্রকৃতিগতভাবে ভাইরাস এক বিশেষ ধরনের জড় রাসায়নিক [illegible] অনুকূলে উল্লেখ্য কয়েকটি যুক্তি—

- [illegible] ভাইরাস কণা আকারে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড অণুর মতোই [illegible]
- একটি বিশেষ প্রজাতির সব ভাইরাস কণাই আকার ও আকৃতিতে সম্পূর্ণ এক [illegible] ভৌত ও রসায়নিক গুণাবলী বিচারেও এদের মধ্যে যে নিখুঁত সমতা দেখা [illegible] তা কেবল একই ধরনের প্রোটিন অণুসমূহের মধ্যে দৃষ্ট সমতার সাথেই তুলনীয়; জীবজগতে একই প্রজাতির কোনো দুটি জীবের মধ্যে এ ধরনের নিখুঁত সমতা দেখা যায় না।
- ভাইরাসের প্রোটিন প্রোটোমার তৈরি ও সেগুলোর বিশেষ সমাবেশের মাধ্যমে ক্যাপসিড গঠন সাধারণ রসায়নিক রীতি অনুসারেই হয়ে থাকে।
- কেলাসন (crystalysation) নামক ভৌত প্রক্রিয়ায় জড় পদার্থের মতোই একটি ভাইরাসকেও কেলাসিত করা যায়; জড় পদার্থের মতো তরল মাধ্যমে নিলম্বিত (suspended) করা যায় ও অধঃক্ষিপ্ত করা যায়।

অণু মতবাদের প্রবক্তাগণ ভাইরাসের জননকেও একটি অজৈব প্রক্রিয়া বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। জনন সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে—পোষক কোষে পূর্ব থেকে উপস্থিত অগ্রবস্তুর (precursor, Northrop. 1938.) সাহায্যে স্বতঃঅনুঘটন (autocatalysis) প্রক্রিয়ায় ভাইরাসের জননক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ভাইরাসের জনন সম্বন্ধে ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যাই এ মতবাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যে সব [illegible] তত্ত্বটি অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে—

ক) সুস্থ পোষক কোষে কোনো অগ্রবস্তুর সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।
খ) ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ ও নিউক্লিক এসিডের অনুলিপন সর্বতোভাবেই উচ্চতর জীবকোষে সংঘটিত উক্ত প্রক্রিয়াদুটির অনুরূপ।

খ) জীব মতবাদ—ভাইরাসের প্রকৃতি (nature) বিচার করলে একে জীব বলে [illegible] করাই সঙ্গত। প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই জীবাণুবিজ্ঞানীগণ ভাইরাসকে জীব বলে সনাক্ত করেন।

- প্রতিটি ভাইরাসই নিজের অনুরূপ আর একটি ভাইরাসের জন্মদান করতে পারে।

---

১ একটি তন্তু প্রোটিনের দুটি পাশাপাশি এমিনো এসিডের দূরত্ব ৩.৫ এংস্ট্রম। একটি DNA সূত্রের পাশাপাশি দুটি বেসের দূরত্ব ৩.৪ এংস্ট্রম। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের ব্যাস ১০ ন্যানোমিটারের কাছাকাছি।

২. ভাইরাসের রয়েছে কৌলিক বা জিনীয় সন্ততি (genetic continuity), অর্থাৎ প্রতিটি ভাইরাস যেমন একটি জিনীয় উৎস থেকে সৃষ্ট, তেমনি প্রতিটি ভাইরাসই আবার নিজস্ব জিনীয় উৎস থেকে পরবর্তী প্রজন্ম উৎপাদন করতে সক্ষম।

৩. দেখা গেছে, ভাইরাস পরিব্যক্ত (mutated) হতে পারে। পরিব্যক্তি (mutation) সংঘটিত হয় এর জিনীয় পর্যায়ে এবং জননের মাধ্যমে তা পরবর্তী প্রজন্মে (generation) সঞ্চালিত (transfered) হয়।

ভাইরাসতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান

[illegible] বেকন ১৬২০ সালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া হিসেবে একটি গবেষণা পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন—পর্যবেক্ষণ (observation), অনুকল্প (hypothesis), পরীক্ষণ (experimentation), তত্ত্ব (theory) এবং প্রাকৃতিক নিয়ম (natural law) বা মহাতত্ত্ব (doctrine)—এ পাঁচটি ব্যবহারিক পর্যায় সমন্বিত পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি[৭] বলে পরিচিত। এটি সহজ, বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিসঙ্গত, বাস্তব ধারণা ও অভিজ্ঞতা সম্মত একটি পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার (phenomenon) বিশ্লেষণ ও অনুধাবনে এটি বিজ্ঞানী সমাজে আদর্শ পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। এ পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞানকেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। যে বিষয়ে মহাতত্ত্ব পর্যায়ের এক বা একাধিক উদ্ভাবন রয়েছে, রীতি অনুসারে তাকেই প্রকৃত বিজ্ঞান আখ্যা দেয়া হয়। গত পঞ্চাশ বছরে ভাইরাসতত্ত্বে যে আবিষ্কার হয়েছে তার পরিমাণ যেমন বিপুল, প্রকারেও তা তেমনি বিচিত্র। উক্ত সময়কালে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বহু বিজ্ঞানী (সারণি ১.৩)। ভাইরাসের রোগাত্মতা (pathogenicity), জনন, জিনতত্ত্ব (genetics) ইত্যাদি বিষয়ে আবিষ্কারগুলো মানুষের চিন্তার রাজ্যে নতুন দ্বারোদ্ঘাটন করেছে।

জীববিজ্ঞানের বৃহত্তর পরিসরে স্বীকৃত মহাতত্ত্বগুলো—যেমন, বিবর্তনবাদ (theory of evolution), বংশগতি তত্ত্ব (theory of heredity) ইত্যাদি ভাইরাসের ক্ষেত্রেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া ভাইরাসতত্ত্বেও রয়েছে এমন কিছু আবিষ্কার যেগুলো মহাতত্ত্ব[৮] বলে স্বীকৃত। ভাইরাসতত্ত্ব বর্তমানে একটি বিজ্ঞান মাত্র নয়, বরং জীববিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

---

৭ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি : ১. পর্যবেক্ষণ—একটি প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ। যেমন, নিউটন দেখেছিলেন একটি আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়লো। ২. অনুকল্প—পর্যবেক্ষিত ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। নিউটনের ব্যাখ্যা ছিল, পৃথিবীর আকর্ষণই আপেলটির পতনের কারণ। ৩. পরীক্ষণ—নিউটন যান্ত্রিক পরীক্ষার সাহায্যে অনুকল্পটির সত্যতা প্রমাণ করলেন। ৪. তত্ত্ব—প্রমাণিত অনুকল্পই তত্ত্ব। ৫. মহাতত্ত্ব—দেশে দেশে কালে কালে পুনঃপুন প্রমাণিত তত্ত্বই মহাতত্ত্ব বা প্রাকৃতিক নিয়ম (natural law) বলে অভিহিত হয়।

৮ ভাইরাসতত্ত্বের কয়েকটি মহাতত্ত্ব (doctrine) :
১. মারক চক্র (lytic cycle),
২. ধারক চক্র (lysogenic cycle),
৩. গুণান্তর (transduction),
৪. ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ, ইত্যাদি।

সারণি ১.১ : ভাইরাসতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীগণ—তাঁদের দেশ, পুরস্কারপ্রাপ্তিকালে বয়স এবং অবদান

বিজ্ঞানীর নাম	দেশ ও বয়স[১]	পুরস্কার প্রাপ্তির বছর—অবদান
Meredith Stanley Batcheller Sumner Howard Northrop (চিত্র ১.২)	USA, 42 USA, 59 USA, 55	**১৯৪৬**—বিশুদ্ধ কেলাস (crystal) রূপে তামাকের মোজাইক ভাইরাস অন্তরণ (isolation), সংগ্রহ ও এর আণবিক গঠনের বর্ণনা।
Franklin Enders Huckle Weller Chapman Robbins	USA, 57 USA, 39 USA, 38	**১৯৫৪**—আবাদকৃত অস্নায়ু টিসু মাধ্যমে পোলিও ভাইরাস উৎপাদন (যা থেকে পরে পোলিও টিকা তৈরি হয়) এবং নতুন ভাইরাসের শনাক্তি ও অন্তরণের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন।
Lwoff Jacob Monod (চিত্র ১.৩)	France, 63 France, 45 France, 55	**১৯৬৫**—একটি ভাইরাস DNA-র পোষক ব্যাকটেরীয় DNA অনুক্রমের (sequence) মধ্যে অঙ্গীভূত (integrated) হওয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারকত্ব (lysogeny) প্রমাণ করা এবং মত প্রকাশ, এনজাইম উৎপাদনের মাধ্যমেই জিন কোষের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।
Francis Peyton Rous Charles Brenton Huggins	USA, 87 Canada, USA, 65	**১৯৬৬**—ক্যান্সার উৎপাদক ভাইরাস আবিষ্কার এবং প্রস্টেটিক ক্যান্সার চিকিৎসায় হরমোনের ব্যবহার সূচনা, যার ফলেই প্রমাণিত হয় ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে রসায়ন (chemical) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা।
Alfred Day Hershey Salvador Edward Luria Max Delbruck (চিত্র ১.৫)	USA, 61 Italy, 57 Germany, USA, 63	**১৯৬৯**—ভাইরাসের জিনীয় দ্রব্যের (gentic material) গঠন ও অনুলিপন কৌশল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং ভাইরাস, ভাইরাসঘটিত রোগ ও ফাজ সংক্রান্ত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
David Baltimore[২] Howard Martin Temin Renato Dulbecco (চিত্র ১.৬)	USA, 37 USA, 41 Italy, USA, 61	**১৯৭৫**—ভাইরাস গবেষণাসূত্রে RNA থেকে DNA উৎপাদক এনজাইম বিপ্রতিলিপক (reverse transcriptase) আবিষ্কার এবং একটি 'সাধারণ কোষ কি করে ক্যান্সার কোষে পরিণত হয়' সে সংক্রান্ত গবেষণা প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে অবদান।

বিজ্ঞানীর নাম	দেশ ও বয়স	পুরস্কার প্রাপ্তির বছর—অবদান
Baruch Samuel Blumberg	USA, 51	১৯৭৬—সংক্রামক কুরু[৩] ও
D. Carleton Gajduseck	USA, 53	হেপাটাইটিস-বি রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার সংক্রান্ত গবেষণা।
Stanley Cohen	USA	১৯৮৬—কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রকারণ
Reta Levi-Montalcini	Itali. USA, 77	(growth regulator factor) সমূহ আবিষ্কার এবং টিউমার, জন্মগত রোগ ও অংকো ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণা।
Gertrude Belle Elion	USA, 70	১৯৮৮—অস্ত্রক্ষত ও হৃদরোগের ওষুধ
George Herbert Hitchings	USA, 83	যথাক্রমে 'সিমেটিডিন' ও 'প্রপ্রানলল'
Sir James Black	Great Britain	প্রস্তুতি এবং হার্পিস, লিউকেমিয়া ও এইডস্-এর চিকিৎসায় ব্যবহার্য এন্টিমেটাবোলাইট উৎপাদনসহ ওষুধ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
Harold Elliot Varmus	USA, 50	১৯৮৯—সব ক্যান্সারেরই উৎপত্তি
J. Michael Bishop	USA, 36	পর্যায়ের (আপাত প্রতীয়মান) সাধারণ ক্রিয়াপথ আবিষ্কার ও সেজন্য বিনষ্ট (damaged) জিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা এবং মত প্রকাশ, মানবের জিনীয় তন্ত্রের মধ্যেই নিহিত থাকে ক্যান্সারের বীজ।

দ্রষ্টব্য : ১. পুরস্কার প্রাপ্তিকালে বয়স।

২. তৃতীয় কলমে বর্ণিত কর্মের প্রথমার্ধ বাল্টিমোর একক ও স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন।

৩. নিউগিনির স্বজাতিভুক (cannibal) নারীদের ধীরভাইরাসঘটিত এক মারাত্মক রোগ।

মানব চোখের দৃষ্টি সীমার বাইরে (১৭০ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসবিশিষ্ট) যে জীবজগৎ আলোক অণুবীক্ষণের দ্বার পেরিয়ে ১৬৭৬ সালে বিজ্ঞানী লিউয়েনহুক আবিষ্কার করেন, শতাধিক বছর পরে তাই ব্যাকটেরিয়া ও অনুরূপজীবদের এক বিরাট জগৎরূপে জীবাণুবিদদের চোখের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই আলোক অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ সীমার বাইরে (৪২৬ ন্যানোমিটারের কম ব্যাসবিশিষ্ট) আরো একটি জীবজগতের অস্তিত্ব বহু বিজ্ঞানীই ধারণা করেছিলেন, কিন্তু তখন আলোক অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ সীমার বাইরে অবস্থিত সে জগৎ চাক্ষুস ও স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আলোক অণুবীক্ষণিক জীবের চেয়ে বহুগুণ ক্ষুদ্র জীবসমূহ অধ্যুষিত সে জগৎ প্রধানত ভাইরাসের জগত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে নানা আকার, আকৃতি ও প্রকৃতির ভাইরাসের সে বিচিত্র জগৎ যখন মানুষের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল, কেবল দর্শনযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয়, জীব হিসেবে আরো অনেক অনন্য (unique) বৈশিষ্ট্যের জন্যও সে জগতের বাসিন্দাগণ মানুষের অধিকতর মনযোগ ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছে দিনে দিনে।

বিজ্ঞানী স্ট্যানলি যখন (১৯৩৫ সালে) বিশুদ্ধ রাসায়নিক কেলাসের (crystal) মতো ভাইরাস অন্তরিত (isolate) ও সংগ্রহ (collect) করতে সক্ষম হন, দেখা গেল এরা কেবল বাহ্যত দৃষ্টিতেই জড় রসায়নের (chemical) মতো নয়, আচরণেও এরা জড়সুলভ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। এরা তরল মাধ্যমে নিলম্বিত (suspended) ও অধঃক্ষিপ্ত (precipitated) হয়, আবার অর্ধকঠিন (semisolid) আগার জেলের (gel) মধ্যদিয়ে ব্যাপিতও (defused) হতে পারে, এমন কি এসব ভৌত (physical) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হওয়ার পরও এরা সংক্রমণ ক্ষমতা বজায় রাখে।

মার্কিন ভাইরাসবিদ লুরিয়া বলেন, এরা কেবল ক্ষুদ্রতম জীবই নয়, জীব হিসেবেও এরা স্বতন্ত্র (different)। অন্যদিকে ভৌত ও আণবিক গঠন বিচারে অন্য সব জীবের তুলনায় সরল হলেও সংক্রমণ (infection) ও অভিযোজন (adaptation) নৈপুণ্যে এরা আরো অগ্রসর (advanced)। মানুষের ধারণায় সব মিলিয়ে এরা জীব ও জীবিত বস্তু সম্বন্ধে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

ব্যাকটেরীয় ভাইরাস যখন আবিষ্কৃত হলো তখন এর পরজীবীতা (parasitism) প্রকৃতির অভিনবত্ব বিজ্ঞানী মহলে চমক সৃষ্টি করল। পরে যখন ফাজ (phage) গবেষণা ব্যাকটেরীয় বংশগতি (heridity) গবেষণার সাথে সমন্বিত করা সম্ভব হলো, তখন জীববিজ্ঞানের অনেক মৌলিক সমস্যার সরলীকরণ সম্ভব হলো ও বহু সমস্যা সমাধানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। উপকোষীয় (subcellular) জীব ভাইরাস গাঠনিক (structural) বিবেচনায় একটি বৃহদাণু (macromolecule)। তাই জীবনের কোষী ও আণবিক ভিত্তি অনুধাবনের জন্য ভাইরাস গবেষণাই সম্ভবত সহজতম এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তদুপরি উপগ্রহ ভাইরাস (satellite virus), ভিরয়েড (viroid), প্রিয়ন (prion) ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে আণবিক জীববিদ্যার (molecular biology) অধিকাংশ গবেষণা এখন ভাইরাসবিদদের আয়ত্তে।

পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ (origin) ও বিবর্তন (evolution) রহস্য আর অনধিগম্য (unknowable) নয়, বলা যায় এ উপলব্ধির বহুলাংশ ভাইরাস গবেষণার অবদান (contribution)। বর্তমানে ভাইরাসতত্ত্বের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক (factual) সঞ্চয়ের (compilation) পরিমাণ ও বৈচিত্র্য (variety), এর অন্তর্নিহিত (internal) বিকাশধর্মিতা (expansivity) ও সার্বিকরণ (generalization) একে একটি সত্যিকার বিজ্ঞানে পরিণত করেছে।

প্রাথমিকভাবে ভাইরাসতত্ত্বের গবেষণা শুরু হয়েছিল মানুষ এবং গৃহপালিত (domestic) উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে। অবশ্য এখনও রোগতত্ত্ব (pathology) ভাইরাস গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাই শুধু নয়, বর্তমানে এ ফলিত (applied) বিষয়ে গবেষণার পরিসর (extent), প্রয়োজন ও সম্ভাবনা (prospect) বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল পরিমাণে। বলা যায়, এর চর্চা (study) ও গবেষণা লাভ করেছে বহুমাত্রিক (multidimentional) বিস্তৃতি। বস্তুতঃ বর্তমানে ভাইরাস গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিসর যে কতো বৃদ্ধি পেয়েছে তা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। উপরন্তু, [illegible] নতুন নতুন ক্ষেত্র ও শাখা সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে দিনে দি[illegible]

ভাইরাস ও মানুষ

মানুষের জীবনে এবং মানব সমাজে ভাইরাসের গুরুত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের জন্য ভাইরাস উপকারক না অপকারক এ প্রসঙ্গে সেটিও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয় ; সবচেয়ে, বড় প্রশ্ন হচ্ছে—যেহেতু ভাইরাসকে সমাজ থেকে এবং মানুষের জীবন থেকে বাদ দেয়া বর্তমানে যেমন সম্ভব নয়, ভবিষ্যতেও কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না এবং যতোদূর জানা যায়, অতীতেও মানুষের সাথে ভাইরাসের ছিল অচ্ছেদ্য সহঅবস্থান, সেহেতু মানুষের সব ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিকল্পনায় একে বিবেচনার বিষয়ীভূত রাখতেই হবে।

মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের বহু গুরুতর সংক্রামক রোগ ভাইরাসঘটিত। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক অত্যন্ত মারাত্মক ও ঘাতক রোগ বলে পরিচিত, যেমন—মানুষের বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, ক্যান্সার, এবোলা, এন্ডিস, হেপাটাইটিস বি, জি ও এফ ; গবাদির মুখ ও পায়ের রোগ (foot and mouth disease of cattle), কুকুরের র‍্যাবিস (rabies), পাখির সারকোমা (sarcoma) ক্যান্সার ; ধানের টুংগ্রো (tungro) ও বামন রোগ (dwarf disease), আলুর পাতা গুটানো (leaf roll) রোগ, তামাক, আলু ও টমেটোর মোজাইক (mosaic) রোগ ইত্যাদি। গৃহপালিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর এমন অনেক রোগ আছে যেগুলো অনেক সময়, আমাদের বিরাট আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের সর্দি, ফ্লু, জলবসন্ত সাধারণভাবে ঘাতক না হলেও খুবই সংক্রামক ও ক্লেশদায়ক। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এইডস, ক্যান্সার এবং আরো নতুন নতুন ভাইরাস। ইতিহাস থেকে জানা যায়, অতীতে পৃথিবীতে এমন কিছু ধ্বংসাত্মক রোগ দেখা দিয়েছিল সেগুলো ছিল মানব সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ। গুটি বসন্ত এমনই একটি প্রাচীন ও ভয়াবহ ভাইরাস রোগ, যা কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছিল।

ভাইরাসের যে বৈশিষ্ট্য একে জীব হিসেবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশেষ এক অস্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে, তা হচ্ছে কিছু সংখ্যক কোষী বিক্রিয়া এর একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন। পোষক কোষের ভিতরে অবস্থানকালে উক্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে কোষেরই উৎপাদন যন্ত্র (synthetic machinery) ব্যবহার করে ভাইরাস নিজের সংবৃদ্ধি (multiplication) ঘটায়। বাইরে থেকে এর বৃদ্ধি, প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানুষের বর্তমান রাসায়নিক ব্যবস্থা খুব বেশি ফলপ্রসূ নয়। অবশ্য বর্তমানে ভাইরাসের উক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীগণ এটি প্রতিরোধের জন্য বিশেষ নির্বাচিত রাসায়নিক প্রতিবিক্রিয়ার (antireaction) কথা ভাবছেন। আশা করা যাচ্ছে সে চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতেই সফল হবে এবং ভাইরাসঘটিত রোগসমূহ নিশ্চিতভাবে নিরাময়কারী ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হবে। শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাই নয়, ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক হিসেবে সরাসরি ভাইরাসের ব্যবহার একটি অতি প্রাচীন ব্যবস্থা। বসন্ত, জলাতঙ্ক, পোলিও, পীতজ্বর, হাম, ফ্লু ও সর্পদংশের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার এবং আরো অনেক রোগের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আণবিক জীববিজ্ঞানীগণ ভাইরাসকে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও সুলভ জীবিত বৃহদাণুর (macromolecule) মডেল বলে মনে করেন। প্রোটিন খোলকে (shall) আবৃত সীমিত

জেনেটিক বস্তু জিন (gene) সূত্র দিয়ে তৈরি এ সরলতম জীবকে তাঁরা জীবদেহের যেকোনো জৈবিক সমস্যা অনুধাবনে এবং আণবিক পর্যায় পর্যন্ত এর কারণ অনুসন্ধানে ব্যবহার্য সবচেয়ে মাধ্যম বলে বিবেচনা করেন। তাই বর্তমানে ভাইরাস গবেষণায় অধিকাংশ পরিকল্পনা বিন্যস্ত হয় সে দৃষ্টিকোণ থেকেই। ভাইরাস জিনোমে যে জিনীয় তথ্য (genetic information) সঙ্কেতবদ্ধ (encoded) থাকে তা এর পোষক জিনোম থেকে ভিন্নতর; ফলে উভয় জিনোমেরই অনুলিপন (replication) ও অভিব্যক্তি (expression) কি করে নিয়ন্ত্রিত হয় তা অনুধাবনেরও সর্বোৎকৃষ্ট ও নির্বিঘ্ন সুযোগ একমাত্র ভাইরাসই আমাদের দিতে পারে। জীবজগতের একেবারে মৌলিক পর্যায়ের কার্যাবলী বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ভাইরাস ও উচ্চতর জীবে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রে একই পারমাণবিক ও রাসায়নিক নিয়মাবলী ক্রিয়াশীল। তাই জীব জগতের বহু মৌলিক বিষয় ও প্রক্রিয়ার রহস্য অনুধাবন যা উচ্চতর জীবের গবেষণায় সহজ নয় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়, সরলতম জীবনের মৌলিক মডেল ভাইরাসের গবেষণায় তা সম্ভব এবং সহজ হবে বলেই ভাইরাসবিদগণ মনে করেন। রোগতত্ত্ব ও জিনতত্ত্বের গবেষণায় যে বড় ধরনের সাফল্যের আভাস ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে, অদূর ভবিষ্যতেই তা অর্জিত হবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

উচ্চতর জীবকে গবেষণা-উপকরণ হিসেবে ব্যবহারে রয়েছে নানা বিধিনিষেধ, উপরন্তু তা অত্যন্ত সময় ও খরচসাপেক্ষ। ভাইরাস গবেষণায় এগুলো কখনই কোন সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তদুপরি জীববিজ্ঞানের প্রতিটি গবেষণা-উদ্যোগের ফলাফল একেবারে আণবিক পর্যায় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের জন্য ভাইরাসই সহজ ও সুলভতম মাধ্যম। তাই বলা যায়, মানুষের বহু অমীমাংসিত জীববৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান এবং বহু অনায়ত্ত মানবিক কল্যাণ-উদ্যোগে সাফল্যের জন্য উজ্জ্বলতম সম্ভাবনার পথ সম্ভবত এটিই।

ভাইরাসতত্ত্বের ইতিহাস

ভাইরাসের বয়স যে মানব সভ্যতার বয়সের চেয়ে কম নয় তার প্রমাণ, মিশরে পিরামিডে সংরক্ষিত কোনো কোনো মমির (খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০-১০০০ অব্দের) দেহে বসন্ত-চিহ্ন দেখা গেছে। মনে করা হয়, ভাইরাস সর্বদাই মানুষের সাথে ছিল, এখনও আছে এবং বলা যায়, ভবিষ্যতেও থাকবে। ভাইরাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক তাত্ত্বিক মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি মত অনুযায়ী, এ সরলতম জীবটির উৎপত্তি হয়েছিল জীবনোন্মেষের প্রাথমিক সময়েই (ভূতাত্ত্বিক বর্ষ গণনায় প্রায় তিন বিলিয়ন বছর বা তিন শত কোটি বছর পূর্বে)। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য তথা লিখিত দলিলী হিসাবে যা পাওয়া যায় তার বয়সও প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। মিশর, চীন ও ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস থেকে যতোদূর জানা যায়, বসন্ত, সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি ভাইরাস রোগ অতি প্রাচীনকাল থেকেই উপর্যুক্ত এলাকাসমূহে ছিল। সম্ভবত ইতিহাসোক্ত প্রাচীনতম মারাত্মক রোগ বসন্ত। পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক সময়ে কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে এর আক্রমণে। ইতিহাসের এক হিসেবে বলা হয়েছে, একমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় কোটিরও বেশি (Smith, ১৯৬২)। সর্দি যদিও কোনো কালেই গুরুতর রোগ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি, তবু প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ আছে সর্দিরও। প্রাচ্যের কোন দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা তেমন গুরুতর রোগ বলে পরিচিত না হলেও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে প্রাচীনকাল থেকেই এটি একটি ঘাতক রোগ বলে পরিচিত। যুক্তরাজ্যেই ১৯১৮-'১৯ সালে এ রোগে

মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ (Smith, ১৯৬২)। ভারতেও এ রোগের প্রকোপ দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে। অতি প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত আর একটি মারাত্মক মানব ভাইরাস রোগ পীতজ্বর (yellow fever)। আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের রোগ বলে পরিচিত এ রোগটি কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর মধ্য আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯১ সালের পর ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এর প্রকোপ দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে। ইতিহাস আছে, ১৮০১ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ২৫,০০০ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন হাইতি দ্বীপের বিদ্রোহ দমনের জন্য। কিন্তু তিন বছর পর পরাজিত হয়ে ফিরে এল মাত্র তিন হাজার সৈন্য। ২২ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল সেদ্বীপে, অবশ্য মানব-বিদ্রোহীদের প্রতিরোধে নয়, পীতজ্বর ভাইরাসের আক্রমণে।

যতোদূর জানা যায়, উদ্ভিদের সবচেয়ে প্রাচীন ভাইরাস রোগ ভগ্ন টিউলিপ (Broken tulip) বা টিউলিপের বর্ণ ভগ্নতা (colour break of tulip)। ১৫৭৬ সালে প্রকাশিত ক্যারোলাস ক্লুসিয়াসের (Carolus Clusius) পুস্তকে সর্বপ্রথম বিচিত্র বর্ণের টিউলিপ ফুলের কথা উল্লেখিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিচিত্র বর্ণের এ টিউলিপ এতই জনপ্রিয় ছিল যে, তখন এর মালিকানা বিবেচিত হতো সামাজিক মর্যাদার প্রতীক বলে; তখন অবশ্য জানা ছিল না যে, এটি একটি ভাইরাস সংক্রমিত রোগ। সর্বপ্রথম একে রোগ বলে অনুমান করা হয় ১৬৭০ সালে 'Trait des Tulip' নামক পুস্তকে। ১৭১৫ সালে 'Art of Gardening' পুস্তকে 'বেল ফুলের সংক্রামক বিবর্ণতা' (transmissible discolouration of jesmin) শীর্ষক যে বিবরণ পাওয়া যায় তা বস্তুত মোজাইকেরই বর্ণনা। ১৭৬৫ সালের কয়েকটি রচনায় আলুর পাতা গুটানো (leaf roll) রোগও এর কারণ সম্বন্ধে কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতামত প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে *Abutilon striatum*-এর একটি বহুবর্ণ জাত (variety) খুব জনপ্রিয় ছিল। পরে জানা গেছে, এটিও ছিল একটি ভাইরাস সংক্রমিত রোগ।

সেই সুদূর প্রাচীনকালে রোগের কারণ সম্বন্ধে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। রোগ সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ছিল নানা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার। রোগকে মনে করা হতো 'আসমানী বালা', 'দেবতার ক্রোধ', 'অপদেবতার প্রভাব', 'devine rath' ইত্যাদি। রোগের প্রতিকারের জন্য তখন মানুষ শরণাপন্ন হতো পীর-ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসীদের। তাবিজ মাদুলি, ঝাড়-ফুঁক এবং নানা প্রকার তদবির ও পূজা ইত্যাদির ব্যবস্থা দেয়া হতো রোগ নিরাময়ের জন্য। সত্য বলতে কি, সে কুসংস্কার ও জ্ঞানান্ধতা এখনও সমাজ থেকে দূর হয়নি। আমাদের প্রাচ্য দেশীয় সমাজ থেকে যে দূর হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। পোলিও, কন্ডিস, ক্যান্সার ইত্যাদি ভাইরাসরোগকে এখনও দুরারোগ্য বলা যেতে পারে, ক্ষেত্র বিশেষে ত বটেই ; এগুলো না হয় বিবেচনার বাইরেই রইল, কিন্তু বসন্ত , কলেরা[৯], যক্ষ্মা[১০], টাইফয়েড[১১] ইত্যাদি যেসব রোগের প্রতিষ্ঠিত ও প্রায় নিশ্চিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব রোগের চিকিৎসার জন্যও এখনও এদেশের বহুলোক ঝাড়-ফুঁক ও সাধু-দরবেশের দ্বারস্থ হন।

---

৯. ব্যাকটেরীয় রোগ।
১০. ব্যাকটেরীয় রোগ।
১১. ব্যাকটেরীয় রোগ।

ভাইরাস প্রতিরোধে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক তৎপরতার সূত্রপাত হয়েছিল যে ঘটনার মধ্য দিয়ে, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে এবং সময়ের বিচারে তা ছিল একটি অত্যন্ত প্রগতিসর (advanced) ঘটনা। ১৭৯৬ সালে যখন ব্যাক্টেরিয়া সম্বন্ধেই খুব সামান্য জানা সম্ভব হয়েছে, ইংল্যান্ডের চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার (Adward Jenner) ভাইরাস সম্বন্ধে কিছু না জেনেই সম্পূর্ণভাবে বসন্তের টীকা আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেন, গব্য খামারে (dairy farm) যারা গরু দোহন করে তাদের হাতে নিয়মিতভাবে বসন্তের মতো ছোট ছোট স্ফোটক সৃষ্টি হলেও তারা কখনও বসন্তে আক্রান্ত হয় না। তখন একটি বিশেষ ধারণার উপর ভিত্তি করে অভিনবভাবে তিনি গোবসন্তের পুঁজ থেকে টীকা তৈরি করতে চেষ্টা করেন এবং সফল হন। টীকার ধারণার এটিই সূত্রপাত এবং এটি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ভাইরাসতত্ত্বের ইতিহাসেও একটি মাইল ফলক (mile stone)।

প্রায় একশ বছর পরের ঘটনা। লুই পাস্তুর (Luis Pasteur) ১৮৬৫ সালে (চিত্র ১.১) এবং রবার্ট কখ (Robert Koch) ১৮৭৬ সালে স্বতন্ত্রভাবে রোগের জীবাণুতাত্ত্বিক কারণ (Germ theory of disease) আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ তাঁরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন, সংক্রমক রোগের কারণ জীবাণুর সংক্রমণ (Contagium vivum)। যদিও তাঁদের গবেষণা ছিল ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ নিয়ে তবু বলা যায় তারই ধারাবাহিকতায় গবেষণার একটু অগ্রবর্তী পর্যায়েই আবিষ্কৃত হয় ভাইরাস।

চিত্র ১.১ : লুই পাস্তুর (Luis Pasteur)। ভাইরাস সম্বন্ধে প্রায় কিছু না জেনেই এবং এর আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবার পূর্বেই (১৮৮০ সালে) র‍্যাবিস ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। (নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন হয় ১৯০১ সাল থেকে। জীববিজ্ঞানে পাস্তুরের আরো একাধিক এমন অবদান রয়েছে, যেগুলো অনেকেই মনে করেন, নোবেল পুরস্কারযোগ্য।)

১৮৮০, পাস্তুর জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগ নিয়ে গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ নয়। তিনি এর প্রতিষেধক (antidote) আবিষ্কার করতেও সক্ষম হন। কিন্তু সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেও তিনি এর রোগাত্মকের (pathogen) প্রকৃতি নিরূপণ (ditermine) করতে অসমর্থ হন এবং মন্তব্য করেন, "উপাণুবীক্ষণিক (submicroscopic), সংজ্ঞাতীত (undefinable) এবং দুর্জ্ঞেয় (obscure) কোনো রোগাত্মক এ রোগের জন্য দায়ী।"

উনিশ শতকের শেষ দিকে তামাকের মোজাইক রোগ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। জার্মানীর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক বিজ্ঞানী এডলফ মায়ার[১২] (Adolf Mayer, ১৮৮৬) এ রোগ সম্বন্ধে গবেষণাকালে লক্ষ্য করেন যে, রুগ্ন গাছের রস সুস্থ গাছে প্রবিষ্ট করিয়ে (inoculate) রোগ সংক্রমণ ঘটানো যায়, অথচ সে রসে কোনো জীবাণুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না। তিনি আরো লক্ষ্য করেন, সে রসকে ৫৫° সে. পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে তা রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা হারায়।

১৮৯১, স্মিথ (E. F. Smith) পীচ হলদে (peach yellow) রোগ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখেন যে এটিও এমন একটি রোগ যা সংস্পর্শ দিয়ে সংক্রমিত হয় এবং এরও রোগাত্মক (pathogen) খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৮৮২, বিজ্ঞানী দিমিত্রি আইভানোভসকি (Dimitri Ivanovski) লক্ষ্য করেন, মায়ার বিবৃত মোজাইক আক্রান্ত তামাক গাছের রস (extract) ব্যাকটেরিয়ারোধী ছাঁকনি[১৩] (bacteria proof filter) দিয়ে ছাঁকার পরও সংক্রমণ ক্ষমতা মুক্ত হয় না। তিনি একে ছাঁকনযোগ্য রোগাত্মক (filtrable pathogen) বলে অভিহিত করেন।

১৮৯৬, হল্যান্ডের জীবাণুবিদ বাইজেরিঙ্ক (Beijerinck) অণুপুঙ্খ গবেষণার পর মন্তব্য করেন যে, তামাকের মোজাইক রোগের কারণ একটি জীবন্ত সংক্রামী তরল রোগাত্মক (Contagium vivum fluidum)। অর্থাৎ কেউই তামাকের মোজাইক ভাইরাসের এ ছাঁকনযোগ্যতার কারণ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি।

এরপর ১৮৯২–১৯৩০ সময়কালে বহু বিজ্ঞানী বহুসংখ্যক ভাইরাস রোগ নিয়ে গবেষণা করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই রোগের ছাঁকনযোগ্যতা (filtrability) প্রত্যক্ষ করা ছাড়া এ ৪০ বছরে ভাইরাস গবেষণায় আর বিশেষ কোনো অগ্রগতি সম্ভব হয় নি; উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৯৪, হাশিমটো (Hashimoto) ও তাঁর সহযোগীগণ জাপানে ধানের বামন রোগের (dwarf disease) ছাঁকনযোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করেন। হাশিমটো আরো লক্ষ্য করেন যে, ধানের এ রোগটির বিস্তারে *Nephotattix apicalis* নামক পতঙ্গ বাহকের ভূমিকা পালন করে। রোগতত্ত্বের ইতিহাসে পতঙ্গকে বাহক (insect vector) হিসেবে শনাক্তির ঘটনা সম্ভবত এটিই প্রথম। অবশ্য হাশিমটোর এ বিশেষ কাজ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নজরে আসে অনেক পরে।

---

১২. মায়ারই সর্বপ্রথম একে মোজাইকের মত (mosaikkrankheit) বলে বর্ণনা করেন।

১৩. Chamberland Roux filter এবং চীনা মাটির তৈরি ছাঁকনি তরল মাধ্যমে নিলম্বিত (suspended) ব্যাক্টেরিয়া পৃথক করার জন্য সে সময় ব্যবহৃত হত।

... লেফলার (F. Loeffler) ও ফ্রসক (A. Frosch) গবাদির মুখ ও পায়ের রোগ (foot and mouth disease of cattle) নিয়ে গবেষণাকালে দেখতে পান, এর রোগাত্মকও ছাঁকনযোগ্য। তবু তাঁরা মত প্রকাশ করেন, 'এগুলো কণাকার (particulate), তবে ভিন্ন প্রকৃতির'।

বিশ শতকের প্রারম্ভে মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গুরুতর সংক্রামক রোগরূপে পীতজ্বরের প্রকোপ দেখা দেয়। পানামায় মহামারীরূপেও রোগটি বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ রোগ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য চিকিৎসক ওয়ালটার রীডের (Walter Reed) নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। উক্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে কিউবার চিকিৎসা বিজ্ঞানী কার্লোস ফিনলে (Curlos Finley, ১৯০১) পীতজ্বর নিয়ে গবেষণাকালে দেখতে পান, এর রোগাত্মকও ছাঁকনযোগ্য। এ রোগের বিস্তারে একটি বাহক পতঙ্গের ভূমিকাও তিনি প্রমাণ করেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রোগ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে বাহক পতঙ্গের (insect vector) উপস্থিতি প্রমাণ করেন। এর ফলে একটি নতুন বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

১৯০৩, আমেরিকার বিজ্ঞানী বল (Ball), এডামস (Adams) এবং শ (Shaw) বীটের কুঞ্চিত শীর্ষ (curly top of sugar beet) রোগ এর সাথে *Eutettix tenella* নামক পত্রভুক পতঙ্গের একই ধরনের যোগাযোগ লক্ষ্য করেন। পরে, ১৯১৫ সালে বিষয়টি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী স্মিথ ও বংক্যুয়েট (Smith and Bonquet)।

১৯০৩, ড. নেগ্রি (Dr. Negri) কুকুরের র‍্যাবিস (Rabies) রোগকে ছাঁকনযোগ্য আক্রমণ বলে প্রমাণ করেন। তিনি এ রোগে আক্রান্ত কুকুরের স্নায়ুকোষে এক প্রকার কেলাসের (crystal) উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।

১৯০৯, মানুষের রক্তের গ্রুপ আবিষ্কারক ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Dr. Karl Landsteiner) ও তাঁর সহযোগীগণ পোলিও রোগেরও অনুরূপ রোগাত্মক (pathogen) পর্যবেক্ষণ করেন।

১৯১১, মার্কিন ভাইরাসবিদ পি. রাউস (P. Rous) দেখতে পান মুরগির সারকোমা ক্যান্সারের কারণও ছাঁকনযোগ্য।

১৯১৫, ইংরেজ জীবাণুবিদ এডওয়ার্ড টর্ট (Adward Twort) একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া আবাদের জন্য মাধ্যম হিসেবে মাটির নির্বীজ (sterile) নির্যাস (extract) ব্যবহার করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, দু'একটি আবাদ পাত্রে ব্যাকটেরীয় লন (lawn) স্থানে স্থানে স্বচ্ছ অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি একে 'ব্যাকটেরীয় লনের স্বচ্ছ রূপান্তর' (glassy transformation, চিত্র ১.২) বলে বর্ণনা করেন। কানাডীয় বিজ্ঞানী ডি হেরেলেও (De Herele) অনুরূপ গবেষণাকালে ব্যাকটেরীয় লনের স্বচ্ছ রূপান্তর লক্ষ্য করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন, একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া একটি বিশেষ মাটির নমুনা নির্যাসে উৎপাদনকালেই এ ঘটনা ঘটছে। তখন বোঝা না গেলেও পরে জানা গেছে, এ যোগাযোগ সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি ঐ ব্যাকটেরিয়া বিধ্বংসী প্রপঞ্চটির (phenomenon) নাম দেন ব্যাকটেরীয় ফাজ (গ্রিক শব্দ phagein অর্থাৎ ভক্ষণ) বা ব্যাকটেরিয়াভুক। ব্যাকটেরীয় ফাজকে ছাঁকন কাগজভেদী বলেও তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন।

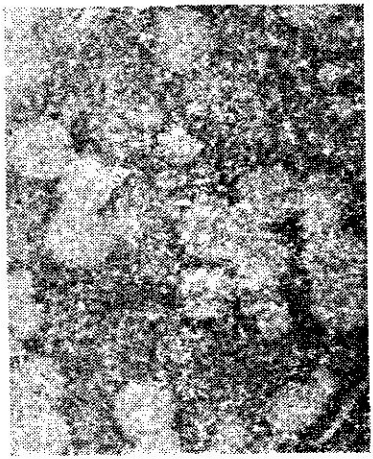

চিত্র ১.২ : ব্যাকটেরীয় লনের স্বচ্ছ রূপান্তর। পয়ঃপ্রবাহ থেকে সংগৃহীত জলকে প্রবিষ্টা (inoculum) রূপে ব্যবহার করে প্রেট্রিপ্লেটে উৎপন্ন করা হয়েছে ব্যাকটেরীয় লন, অতঃপর তাতেই স্বচ্ছ রূপান্তরিত এলাকা (ফাজ প্লেক)গুলো সৃষ্টি হয়েছে। (সৌজন্যে : জীবাণুতত্ত্ব গবেষণাগার, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি.)।

১৯৩২, বিজ্ঞানী নল (M. Knoll) এবং রাসকা (E. A. F. Raska) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু এতে ভাইরাস পর্যবেক্ষণ উপযোগী প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হতে সময় লেগেছে আরও প্রায় দশ বছর।

১৯৩৩, নিলম্বন (suspension) মাধ্যম থেকে অতিক্ষুদ্র ও হাল্কা কণাসমূহ পৃথক করার যন্ত্র আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ আবিষ্কৃত হয়। মার্কিন বিজ্ঞানী শ্লেসিঙ্গার (Martin Schlesinger) সর্বপ্রথম এ যন্ত্রের সাহায্যে কলিফাজ WLL অন্তরিত (isolate) করতে সমর্থ হন। তিনি এর রাসায়নিক বিশ্লেষণও করেন এবং এটি প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড ও ফসফোরিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত বলে মত প্রকাশ করেন।

১৯৩৫, মার্কিন রসায়নবিদ স্ট্যানলি (W. M. Stanley) এবং তাঁর সহযোগী নরথ্রপ ও সামনার (চিত্র ১.৩) তামাকের মোজাইক ভাইরাসকে বিশুদ্ধ কেলাসরূপে অন্তরিত করেন। তাঁদের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁরা ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৩৫-৩৮, ইংরেজ জৈবরসায়নবিদ পিরি (N. W. Pirie) ও বাউডেন (F. C. Bawden) তামাকের মোজাইক ভাইরাস এবং আরও কয়েকটি ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করেন এবং প্রমাণ করেন, এগুলো প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড (DNA অথবা RNA) দ্বারা গঠিত।

১৯৪১-৪৬, বিজ্ঞানী উইলিয়ামস (R. C. Williams), উইকফ (Wycoff), হর্ন (R. W. Horne), এন্ডারসন (T. A. Anderson) এবং সিডনি ব্রেনার (Sidney Brenner) ভাইরাস পর্যবেক্ষণে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান রাখেন এবং সফলভাবে বহুসংখ্যক ভাইরাসের ভৌত (physical) গঠন পর্যবেক্ষণ করেন।

ক খ গ

চিত্র [illegible] : (ক) জন এইচ. নরথ্রপ (John H. Northrop), (খ) উইনডেল এম. স্ট্যানলি (Wendell M. Stanley) এবং (গ) জেমস বি. সামনার (James B. Sumner) সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ কেলাসাকার রাসায়নিক কণারূপে ভাইরাস পৃথক করতে সক্ষম হন। এ কাজের জন্য তাঁরা ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন

[illegible]. এন্ডার্স (J. Enders) সর্বপ্রথম কৃত্রিমভাবে আবাদকৃত একটি টিস্যু মাধ্যমে [illegible] পলিও ভাইরাস উৎপাদন করতে সক্ষম হন।

পরবর্তী ১৫ থেকে ২০ বছরে ভাইরাস গবেষণায় বহু উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। [illegible] ভাইরাস পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে উচ্চ বিশ্লেষণক্ষম ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ব্যবহার এবং এর [illegible] এক্সরে কেলাস চিত্রগ্রহণ (crystallography) ও এক্সরে বিচ্ছুরণ (diffraction), [illegible] রোটেশন ইত্যাদি। এ সময়ে ভাইরাস আবাদ সংক্রান্ত নানা প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত [illegible] গবেষণায় খুব দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়।

[illegible]. শেফারম্যান (Shafferman) ও মরিস (M. E. Morris) সায়ানোফাজ আবিষ্কার করেন।

[illegible]. লেডারবার্গ (J. Laderberg) ও জিন্ডার (N. Zinder) ট্রান্সডাকশন বা [illegible] আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী হার্শে (A. D. hershey) ও চেস (N. Chase) ভাইরাসের সংক্রামী অংশ হিসাবে নিউক্লিক এসিড ও অসংক্রামী অংশ হিসাবে প্রোটিন শনাক্ত করেন। এরপর থেকেই ব্যাকটেরিয়ার বংশগতি গবেষণায় ভাইরাসের ব্যবহার শুরু হয়।

[illegible]. লিফ এবং ওলম্যান (E. Wollman) সুমিত (temperate) ফাজ আবিষ্কার করেন।

[illegible]. তকাহাশি এবং ফ্রিংকেল কনরাট (H. Fraenkel-Conrat) তামাকের [illegible] ভাইরাসকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ এবং পুনঃসংশ্লেষণ করেন। মুনড্রি (Mundry) [illegible] নাইট্রাস বেজকে পরিবর্তিত করে তামাকের মোজাইক ভাইরাসের [illegible]

Dhaka

mutation) ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে পরিব্যক্তির প্রাণ রাসায়নিক (biochemical) ভিত্তি সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়।

১৯৫৭, আইজাক্স্ (A. Isacs) ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন। এ সময়েই জোন্স্ সল্ক (Jones Salk) এবং এলবার্ট সেবিনে (Albart Sabine) পোলিওর প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন।

১৯৫৫–৫৭, ফ্রাঙ্কলিন (R. Franklin), ক্লুং (A. Klung), হোলমেস (K. C. Holmes), নাইট (A. C. Knight) এবং হ্যারিস (J. Harris) তামাকের মোজাইক ভাইরাসের আণবিক গঠন সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। ফলে কৃত্রিমভাবে ভাইরাস সংশ্লেষণ সম্ভব—এ ধারণার উন্মেষ ঘটে।

১৯৫৯, সিনশিমার (R. L. Sinsheimar) এক সূত্র DNA বিশিষ্ট ϕX174 ব্যাকটেরীয়ফাজ আবিষ্কার করেন। ব্রেনার, স্ট্রেসিংগার (G. Stresinger), হর্ন এবং ক্রাউদার (D. Crowther) T2 ফাজের আণবিক গঠন সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করেন।

১৯৬০, টাম (I. Tamm) ও তাঁর সহযোগীগণ, বয়ের (J. D. Bauer) ও তাঁর সহযোগীগণ এবং জোকলিক (N. K. Zoklik) ও তাঁর সহযোগীগণ ভাইরাসের বৃদ্ধিরোধ ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

১৯৬৪–৭০, টেমিন (H. Temin) ও বাল্টিমোর (Baltimore) RNA নির্ভর DNA আবিষ্কার করেন। এ অনন্য প্রপঞ্চ ভাইরাস ব্যতীত অন্য কোনো জীবে দেখা যায় না।

১৯৬৫, আন্দ্রেলোফ, জ্যাকব ও মনোড (চিত্র ১.৪) সর্বপ্রথম ধারক প্রমাণ করেন।

ক খ গ

চিত্র ১.৪ : (ক) এফ. জ্যাকব (F. Jacob), (খ) আন্দ্রে লোফ (Andre Lwoff) এবং (গ) জে. মনোড (J. Monod) সর্বপ্রথম ধারকত্ব (lysogeny) প্রমাণ করেন। একটি ভাইরাস DNA-র একটি ব্যাক্টেরীয় DNA অনুক্রমে অঙ্গীভূত (integrated) হওয়া প্রদর্শন করেন। তাঁরা ১৯৬৫ সালে তাঁদের অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাস ভাইরাসতত্ত্বের একটি জটিল অধ্যায়। সুনির্দিষ্ট ও প্রমিত ... তুলনাযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ভিত্তিক এমন কোন শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো কখনও তৈরি ... সম্ভব হয়নি, যার মাধ্যমে জানা সকল ভাইরাস বিবেচিত ও বিন্যস্ত হতে পারে। ... ক্ষেত্রেই ১৯৬৬ সালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করেন লোফ, হর্ন ও টুর্নিয়ার (P. Tournier)। ভাইরাসসমূহের জন্য তাঁরা যে ব্যাপকভিত্তিক শ্রেণীবিধি প্রণয়ন করেন তা ছিল ... যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত এবং তা অধিকাংশ ভাইরাস বিজ্ঞানীর সমর্থন লাভ করে।

১৯৬৫–৬৯, সালভেদর লুরিয়া (S. E. Luria) এবং ম্যাকস ডেলব্রুক (Max Delbruck) এবং হার্শে (চিত্র ১.৫) ভাইরাসের অনুলিপন ও সংবৃদ্ধি (multiplication) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন ও অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তাদের অবদানের জন্য তাদের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৭১, মেরিল (C. R. Merril), গিয়ার (M. R. Gier) এবং পেট্রিসিয়ানি (J. C. Petreciani) মানব যোজককোষে (fibroblast) গুণান্তর (transduction) আবিষ্কার করেন।

১৯৭৩, শিডোলোভসকি (D. Schidolovski) এবং আহমেদ (R. Ahmed) প্রাইমেট ... তে ভাইরাস ক্যান্সার আবিষ্কার করেন।

১৯৭৩–৭৪, সেরিনে ও টাম হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস দ্বারা মানুষের ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্দেশ করেন।

১৯৭৪, বিজ্ঞানী বক (Bock) ও অন্যরা ১ সূত্র DNA বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বর্তুলাকার (spherical) ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

ক খ গ

চিত্র ১.৫ : (ক) ম্যাক্স ডেলব্রুক (Max Delbruck), (খ) সালভেদর ই. লুরিয়া (Salvador E. Luria) এবং (গ) আলফ্রেড ডে হার্শে (Alfred Day Hershey) যৌথভাবে ব্যাকটেরীয় কাজের অনুলিপন ও সংক্রমণ সংক্রান্ত গবেষণায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং তাঁরা এ কাজের জন্য ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৭৫, টেমিন, বাল্টিমোর ও ডালবিকো (চিত্র ১.৬) টিউমার ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণায়, সম্মিলিত অবদান রাখেন।

ক খ গ

চিত্র ১.৬ : (ক) হওয়ার্ড এম. টেমিন (Howard M. Temin), (খ) ডেভিড বালটিমোর (David Baltimore) এবং (গ) রেনাটো ডালবিকো (Renato Dulbecco)। ভাইরাস ও বিশেষ ধরনের টিউমারের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারে অসামান্য অবদান রাখেন। এ কাজের জন্য তাঁদের ১৯৭৫ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

১৯৭৬, ক্যাপার (Kaper) ও অন্যরা উপগ্রহ RNA ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

১৯৭৯, বিজ্ঞানী নিশিগুচি (Nishiguchi) ও অন্যরা TMV ভাইরাসের পোষক দেহে কোষ থেকে কোষে স্থানান্তরণ (transmission) কে একটি ভাইরাসের জিনোম নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া বলে প্রমাণ করেন।

১৯৮২, হাল্ক (Halk) ও অন্যরা এবং ব্রায়ান্ড (Briand) ও অন্যরা স্বতন্ত্রভাবে একক ক্লোন (monoclonal) এন্টিবডির ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

উপর্যুক্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীতে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ নেই। এ বর্ণনা থেকে সময়ের বিচারে এ বিজ্ঞানটির অগ্রগতি ও পর্যায় অনুধাবনে ভাইরাসতত্ত্বে আগ্রহী পাঠকের কিছুটা সহায়তা হতে পারে, কিন্তু তার ইতিহাস তৃষ্ণা মিটবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাইরাস গবেষণা

ডাচ বিজ্ঞানী এডলফ মায়ার ১৮৮৬ সালে মোজাইক আক্রান্ত তামাক গাছের রস (sap) দিয়ে সুস্থ গাছে রোগ সংক্রমণ করেন। বলা যায়, সেটিই ছিল ভাইরাস গবেষণার সূত্রপাত। ব্যাকটেরিয়ারোধী ছাঁকন কাগজ যে ভাইরাসরোধী নয় এ প্রপঞ্চটি (phenomenon) প্রথম লক্ষ্য করেন বাইজেরিঙ্ক (১৮৯৬)। এরপর অনেক বিজ্ঞানী ভাইরাসের এ বৈশিষ্ট্যটিই বহু ভাইরাসের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন। এছাড়া পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ভাইরাস গবেষণা খুব বেশি এগোয়নি। স্ট্যানলি কর্তৃক রাসায়নিক পদ্ধতিতে তামাকের মোজাইক ভাইরাসকে বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার (crystalline) কণারূপে অন্তরিত করা (isolate) ছিল সে সময়ের (১৯৩৫) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৩২ সালে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এতে ভাইরাস দর্শন উপযোগী প্রযুক্তি তখনও অনায়ত্ত ছিল। প্রায় এক দশক পরে উইলিয়াম ও ওয়াইকফ্ ভাইরাস পর্যবেক্ষণে এর ব্যবহার করতে সক্ষম হন। তারপরই ভাইরাস গবেষণার ক্ষেত্র বেশ গতিশীল হয়ে ওঠে। পরবর্তী পঁচিশ বছরে ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পদ্ধতির বিশেষ প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়। সাথে সাথে ভাইরাস অন্তরণ (isolation) ও আবাদের যথাযথ পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে গবেষণায় বিপুল অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটে।

ভাইরাস গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি

রোগ লক্ষণই উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করার উপায়। কোন জীবদেহে ভাইরাসের উপস্থিতি সন্দেহ হলেই ভাইরাসবিদকে তিনটি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানতে হয়—(ক) সন্দেহভাজন ভাইরাসটির যথাযথ পোষক, (খ) সংক্রমণের পথ এবং (গ) শনাক্তিযোগ্য (identifiable) লক্ষণ। এসব বিষয় জানার জন্য পরীক্ষামূলক সংক্রমণ ঘটানো অর্থাৎ পরীক্ষামূলকভাবে লক্ষণ উৎপাদন ভাইরাস গবেষণার একটি মৌলিক প্রক্রিয়া, তার রোগ লক্ষণ ও সংক্রামী রোগাত্মকের (pathogen) মধ্যে যোগাযোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞানী কখের (Koch) প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসরণই প্রতিষ্ঠিত উপায়। ভাইরাস রোগ ও রোগাত্মক শনাক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষ সমন্বয় সাধন করে কখ্ প্রস্তাবিত গবেষণা পর্যায়গুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন বিজ্ঞানী রিভার্স। রিভার্স (Rivers) কর্তৃক পুনর্বিন্যস্ত কখের (Koch) স্বীকার্য (postulate) সমূহ :

১. রুগ্ন পোষক দেহ থেকে ভাইরাস অন্তরণ করা (isolate) ;

২. পরীক্ষামূলক পোষকের দেহে বা কোষে ভাইরাস আবাদ করা ;

৩. উক্ত আবাদ থেকে সংগৃহীত ভাইরাসের ব্যাকটেরিয়ারোধী ফিল্টারে ছাঁকন যোগ্যতা যাচাই করা ;

৪. ছাঁকনযোগ্য ভাইরাসকে পূর্বোক্ত পোষক প্রজাতির দেহে পুনপ্রবিষ্ট (inoculate) করালে একই রোগ উৎপন্ন হওয়া ;

৫. উপর্যুক্ত পোষক থেকে একই ভাইরাস জাতক (strain) পুনঅন্তরিত (isolated) হওয়া।

ভাইরাস গবেষণা পদ্ধতি

আবাদ করা ও সনাক্ত করা এ দুটি প্রক্রিয়াই ভাইরাস গবেষণার ব্যবহারিক ভিত্তি। তবে সংক্রমণযোগ্য একটি ভাইরাস সম্বন্ধে জটিল ও সময়সাপেক্ষ গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই কয়েকটি সহজ ও প্রাথমিক পরীক্ষার দ্বারা এর সম্বন্ধে অন্তত তিনটি তথ্য জেনে নেয়া প্রয়োজন, যথা—

(১) যথাযথ পোষক কোষে প্রবিষ্ট করিয়ে এর সংক্রামিতা পর্যবেক্ষণ করা এবং উক্ত পোষক থেকে নিষ্কাসিত নির্যাসে (extract) এর আয়ুষ্কাল (longevity) জেনে নেয়া,

(২) উক্ত নির্যাসে নিলম্বিত (suspended) ভাইরাসে বিভিন্ন মাত্রার তাপ প্রয়োগের পর প্রতিবার নির্দিষ্ট পোষকে প্রবিষ্ট করিয়ে এর জীবন্ততা (viability) পরীক্ষা করা এবং এর তাপ নিষ্ক্রিয়তা বিন্দু (heat-inactivation-point) নির্ধারণ করা,

(৩) বিভিন্ন অনুপাতে তরলীকৃত (১ ঃ ১০ থেকে ১ ঃ ১,০০০,০০০ পর্যন্ত) ভাইরাস নিলম্বনকে যথাযথ পোষকে প্রবিষ্ট করিয়ে সংক্রামিতা (infectivity) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর তরলান্ত বিন্দু (dilution-end-point) নিরূপণ করা। ১ ঃ ১০০ তরলীকরণের পরেই যে নিলম্বন সংক্রামিতা হারায় তা থেকে ভাইরাস পৃথক করা খুব কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ভাইরাস গবেষণার ব্যবহারিক প্রক্রিয়াটিকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায় ; যথা—

ক. রুগ্ন জীবদেহ বা দেহাংশ থেকে ভাইরাস অন্তরণ (isolate) করা ;

খ. অন্তরিত ভাইরাসকে সংবেদী (susceptible) কোষ, টিসু বা জীবদেহে উৎপন্ন বা আবাদ করা এবং

গ. আবাদকৃত ভাইরাসকে শনাক্ত করা এবং সম্ভাব্য সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিশীলনের মাধ্যমে এর গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অবহিত হওয়া।

ক. ভাইরাস অন্তরণ (Virus isolation)

ভাইরাস একটি বাধ্য (obligate) পরজীবী। একে পোষক কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কখনো পাওয়া যায় না। কিন্তু এর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট গবেষণা এবং পোষক নিরপেক্ষ তথ্য

গবেষণার জন্য বিশুদ্ধ ভাইরাস সংগ্রহ করা অবশ্য প্রয়োজন। ভাইরাসকে পোষক থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংগ্রহ করবার জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। যথা—

১. অতি–ছাঁকন (ultra-filtration),
২. অতি–অপকেন্দ্রীকরণ (ultra-centrifugation) এবং
৩. অধঃক্ষেপণ (precipitation)।

নিলম্বন তৈরি বা প্রাথমিক প্রস্তুতি : অন্তরণ পদ্ধতি যাই হোক না কেন ভাইরাস দূষিত (infested) নমুনাটিকে একটি উপযুক্ত মাধ্যমে নিলম্বিত করে নিতে হবে। নমুনাটি যদি কঠিন হয়, যেমন, ব্যাকটেরীয় মৃতাবশেষ (lysate), উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ বা দেহাংশ ইত্যাদি, তাহলে প্রথমেই তা সমসত্ত্বকর (homogenizer) যন্ত্রে চূর্ণ করে নিতে হবে ; আর নমুনাটি যদি তরল হয় যেমন, উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহস্থ তরল ইত্যাদি, তাহলে তা সরাসরি একটি উপযুক্ত বাফার[১] (buffer) দ্রবণে মিশিয়ে নিলম্বন প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে পাতলা রেশমি কাপড়ে ছেঁকে নিলম্বন থেকে বৃহদাকার অপদ্রব্য (impurity) কণাসমূহ পৃথক করে নেয়া যেতে পারে।

১. অতি–ছাঁকন (Ultra-filtration)

একটি নিলম্বন মাধ্যম থেকে নিলম্বিত কণাসমূহ পৃথক করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নির্দিষ্ট মাপের ছিদ্রবিশিষ্ট ছাঁকনির সাহায্যে তা ছেঁকে নেয়া। বিভিন্ন আকারের কণার জন্য বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট ছাঁকনির ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি মাধ্যমে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নিলম্বিত অবস্থায় রয়েছে। এ থেকে ভাইরাস অন্তরিত (isolate) করতে হলে প্রথম পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ারোধী ছাঁকনি[২] দিয়ে নিলম্বনটি ছেঁকে নিলে ছাঁকনির উপর সব ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়ে যাবে এবং বিশুদ্ধ ভাইরাস নিলম্বন পাত্রে জমা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে একে ভাইরাসরোধী অতি–ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিলেই ভাইরাস পৃথক হয়ে যাবে (চিত্র ২.১)। বিভিন্ন আকারের ভাইরাস কণা পৃথক করার জন্য বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্টার[৩] পাওয়া যায়, তবে ছাঁকন পদ্ধতি কখনই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কোন কোন মাইকোপ্লাজমা, ক্লামাইডি, রিকেটসি ইত্যাদি আকারে প্রায় ভাইরাসের কাছাকাছি। এ পদ্ধতিতে ভাইরাসকে এদের থেকে পৃথক করা যায় না।

---

১. এমন কিছু বিশেষ দ্রবণ রয়েছে যেগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে একটি তরল মাধ্যমে মেশানো হলে সে মাধ্যমের pH একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে। নির্দিষ্ট pH সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত এসব দ্রবণকে বাফার বলা হয়।

২. Seitz type filters বা Porcelain G-5 filters বা Millipore filters ইত্যাদি।

৩. সেলুলোজ এসিটেট বা কলডিয়ন ঝিল্লী বড় সাইজের ভাইরাসের জন্য ; আমেরিকার মিলিপোর ফিল্টার কোম্পানি নানা মাপের ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্টার কাগজ তৈরি করে। একে ছাঁকন ঝিল্লি (membrene filter) বলে।

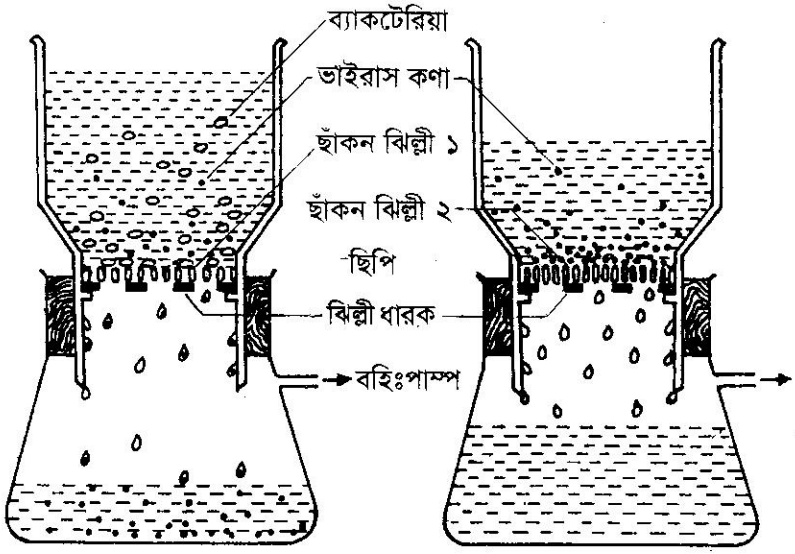

চিত্র ২.১ : ছাঁকন প্রক্রিয়ায় ভাইরাস অন্তরণ (isolation)।

২. অতি-অপকেন্দ্রীকরণ (Ultra-centrifugation)

একটি মাধ্যমে বিভিন্ন ওজনের কণা নিলম্বিত থাকলে সবচেয়ে ভারি কণাগুলো সবার আগে পাত্রের তলদেশে জমতে থাকবে। অপেক্ষাকৃত কম ওজনের কণাগুলো জমবে পরে। কণাসমূহের উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের পার্থক্যই এর কারণ। এটি একটি ধীর পদ্ধতি। একে থিতানো (sedimentation) বলা হয়। বিশেষত অতিক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে থিতানো একটি অতি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কণাসমূহের উপর মাধ্যাকর্ষণ বল বাড়িয়ে দিয়ে থিতানো প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা যায়। নিলম্বনটিকে একটি অপকেন্দ্রীয়করণ (centrifuge) যন্ত্রের সাহায্যে অপকেন্দ্রীকরণ করা হলে নিলম্বিত কণাসমূহের উপর অপকেন্দ্রীকরণ বল প্রযুক্ত হয় এবং তা মাধ্যাকর্ষণের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে থিতানো প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। অতিদ্রুত গতির ঘূর্ণন দ্বারা অতিক্ষুদ্র কণাসমূহকে অল্প সময়ে নিলম্বিত করা যায়। যে গতির ঘূর্ণনে মাধ্যাকর্ষণ বল কমপক্ষে এক হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়, তাকে অতি অপকেন্দ্রীকরণ (ultra-centrifugation) বলে। ঘূর্ণনের গতিবেগ দু'ভাবে প্রকাশ করা হয় ; যেমন—প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা (rpm = revolution per minute) অথবা মাধ্যাকর্ষণ বৃদ্ধির হার (xg, g = gravity)।

কোনো মাধ্যম থেকে ভাইরাস পৃথক করতে হলে একে দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে অপকেন্দ্রিত করতে হবে। প্রথমে নিম্ন গতির ঘূর্ণনে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য বৃহত্তর কণাসমূহ থিতিয়ে

স্তরে ও পৃথক হয়ে যাবে, অতঃপর উপর থেকে বিশুদ্ধ ভাইরাস নিলম্বন অন্য সেন্ট্রিফিউজ নলে ঢেলে নিয়ে অতি উচ্চ গতিতে অপকেন্দ্রিত করা হলে ক্ষুদ্রতর ভাইরাস কণাসমূহ পাত্রের তলদেশে থিতিয়ে পড়বে। শ্লেসিঙ্গার সর্বপ্রথম (১৯৩৩) এ পদ্ধতিতে WLL ভাইরাস অন্তরিত করেন।

বর্তমানে একটি ভিন্নতর পদ্ধতিতে অপকেন্দ্রীকরণের দ্বারা অন্তরণ প্রক্রিয়ায় আরও উন্নততর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ রীতিতে ভাইরাস নিলম্বনকে নির্দিষ্ট ঘনত্বের সুকরোস অথবা সিজিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের সাথে মিশিয়ে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন অতিউচ্চ গতিতে (40,000×g) অপকেন্দ্রিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় নিলম্বিত কণাসমূহ অপকেন্দ্রীকরণ নলের তলদেশে জমে না, বিভিন্ন নির্দিষ্ট উচ্চতায় এক একটি ঘণীভূত স্তর তৈরি করে। নিলম্বনে বিভিন্ন আকারের কণা থাকলে কণাসমূহ আকারের ক্রমানুসারে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন স্তর তৈরি করে। এরপর পাত্রের তলদেশে অবস্থিত নির্গম পথে (out let) ইচ্ছে মতো নির্দিষ্ট স্তর পৃথক করে নেয়া যায়। এ পদ্ধতিকে ঘনত্বক্রমিক অপকেন্দ্রীকরণ (density gradient centrifugation) বলে (চিত্র ২.২)।

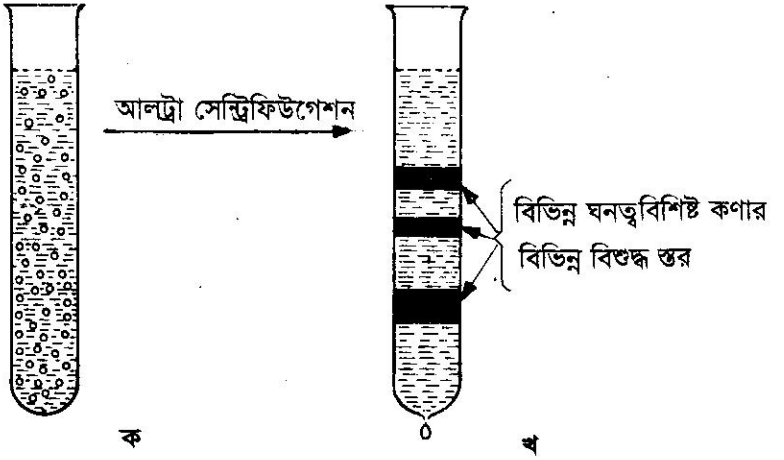

চিত্র ২.২ : ঘনত্বক্রমিক সেন্ট্রিফিউগেশন। (ক) আলট্রাসেন্ট্রিফিউগেশনের জন্য তৈরি ভাইরাস নিলম্বন, (খ) আলট্রাসেন্টিফিউগেশনের পরবর্তী অবস্থা।

৩. অধঃক্ষেপণ (Precipitation)

কেলাসন (crystallization) এবং অধঃক্ষেপণই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ভাইরাসিকে সকল অপদ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তরণ করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এ প্রক্রিয়া দুটি ভাইরাস অন্তরণের জন্য নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

DOC ... Dhaka

৩.১. রাসায়নিক পদ্ধতি : নিলম্বিত (suspended) ভাইরাসসহ নমুনা নির্যাসকে প্রথমে ছাকন ও অপকেন্দ্রীকরণের দ্বারা বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। অতঃপর এমোনিয়াম সালফেট (৩০% দ্রবণ) অথবা ইথানল প্রয়োগ করলে ভাইরাসের অধঃক্ষেপণ ঘটবে। তখন সেই অধঃক্ষেপণকে ছেঁকে পৃথক করে নেয়া যায়। একে উপযুক্ত বাফার দ্রবণে দ্রবীভূত করে পুনরায় অধঃক্ষিপ্ত করা যায়। ভাইরাস অন্তরণে যথেষ্ট বিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য এরূপ দ্রবণ–অধঃক্ষেপণ–ছাঁকন প্রক্রিয়া পর পর কয়েকবার করতে হয়।

৩.২. pH সমন্বয় : নিলম্বন মাধ্যমে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব (pH) নিয়ন্ত্রণ করেও ভাইরাসের অধঃক্ষেপণ ঘটানো যায়। প্রোটিন অণুর পৃষ্ঠে (surface) দু'ধরনের বিদ্যুৎ (charge) থাকে, ইতিবাচক (positive বা +) এবং নেতিবাচক (negative বা –)। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোটিন অণুপৃষ্ঠের এ নেতি ও ইতি–বিদ্যুৎ শক্তি পরস্পর সমান না হয়, প্রোটিন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। যখনই উভয় বিদ্যুৎ শক্তি সমতা প্রাপ্ত হয়, প্রোটিন অধঃক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন নির্দিষ্ট pH–এ বিভিন্ন প্রোটিন অণুর পৃষ্ঠ–বিদ্যুতের সমতা প্রাপ্তি ঘটে ও অধঃক্ষেপণ ঘটে। দ্রবণের যে বিশেষ pH–এ নেতি ও ইতি বিদ্যুতের সমতা প্রাপ্তি ঘটে, তাকে সমবিদ্যুৎ–বিন্দু বলে (iso-electric point)। বিভিন্ন প্রোটিনের সমবিদ্যুৎ বিন্দু বিভিন্ন হয়ে থাকে। বিশেষ কোনো লবণের দ্রবণরূপে কেটায়ন বা ইতিআয়ন (M_g^{++}, Ca^{++}, H^+ ইত্যাদি) এবং এনায়ন বা নেতি আয়ন (Cl^-, PO_4^{--} ইত্যাদি) সরবরাহ করার মাধ্যমে সমবিদ্যুৎ বিন্দুতে উপনীত হওয়া যায়। এভাবেই দ্রবণস্থিত প্রোটিনের ইচ্ছামত অধঃক্ষেপণও ঘটানো যায়। এ পদ্ধতিতেই ভাইরাসের ক্যাপসিড প্রোটিনের pH সমন্বয় দ্বারা ভাইরাসকে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়।

৩.৩. ক্রোমোটোগ্রাফি : ভাইরাসের ক্যাপসিড প্রোটিনের পৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের (surface character) জন্য ভাইরাস কণাসমূহ বিভিন্ন অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তুর দ্বারা উপশোষিত (adsorbed), বা সংশ্লিষ্ট হতে পারে। এম্বারলাইট (amberlite), রজন (dowex resin) ক্যালসিয়াম ফসফেট ($CaPO_4$), সিলিকাজেল ইত্যাদি দ্বারা ভাইরাস উপশোষিত হতে পারে। তলদেশে নির্গম পথযুক্ত একটি লম্বা কাঁচনল উপর্যুক্ত কোন একটি বস্তু দ্বারা পূর্ণ করে ক্রোমোটোগ্রাফি স্তম্ভ তৈরি করা হয়। অতঃপর এর মধ্য দিয়ে ভাইরাস নিলম্বন প্রবাহিত করা হয়। নির্গমপথ খোলা রাখা হয়। ক্রোমোটোগ্রাফি স্তম্ভের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নিলম্বন বাহিত ভাইরাস কণাসমূহ এর মধ্যে উপশোষিত হয়ে ভেতরে থেকে যায়। সকল অপদ্রব্যসহ তরল অংশ নিম্নস্থ নির্গম পথে বেরিয়ে যায়। এরপর বিশেষ ধৌতি দ্রব্য ক্রোমোটোগ্রাফি স্তম্ভের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত করলে ভাইরাস কণাসমূহ ক্রোমোটোগ্রাফি দ্রব্য থেকে বিধৌত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ধৌতি দ্রবণের সাথে নির্গম পথে বেরিয়ে আসবে (চিত্র ২.৩)। ভাইরাসের প্রতি তীব্র রাসায়নিক আসক্তি আছে এবং ক্রোমোটোগ্রাফি দ্রব্য ও অপদ্রব্যের প্রতি আসক্তি নাই বা অপেক্ষাকৃত কম আছে এক্ষেত্রে এমনই একটি ধৌতি দ্রব্য নির্বাচন করা হয় ; যেমন, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ। এরপর ধৌতি দ্রব্য থেকে নির্দিষ্ট রসায়ন প্রয়োগে অধঃক্ষেপণ ঘটিয়ে ছাঁকন প্রক্রিয়ায় ভাইরাস পৃথক করে নেয়া হয়।

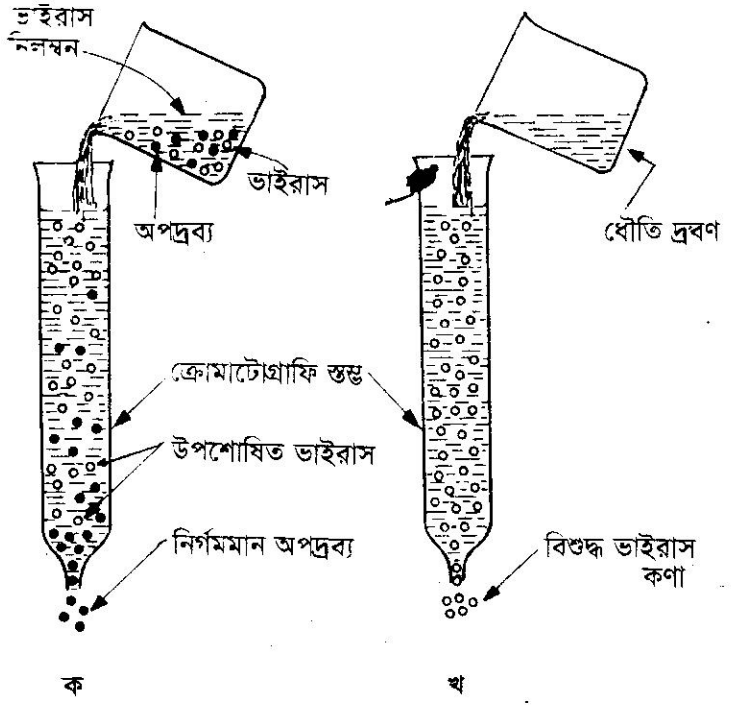

চিত্র ৩.৩ : ক্রোমোটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ভাইরাস নিলম্বন বিশুদ্ধকরণ। (ক) অপদ্রব্য ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও ভাইরাস উপশোষিত হচ্ছে, (খ) বিশেষ ধৌতি দ্রবণের দ্বারা ভাইরাস কণা ধুয়ে বেরিয়ে আসছে।

৩.৪. দ্রাবক বৈষম্য : একই বস্তুর দুটি দ্রাবক (solvent) থাকতে পারে এবং বস্তুটি একটি দ্রাবকে অন্যটির চেয়ে বেশি দ্রবণীয় হতে পারে। ধরা যাক, ভাইরাসের একটি জলীয় নিলম্বনে কিছু অপদ্রব্য (impurity) রয়েছে। অপদ্রব্যগুলো জলের চেয়ে অন্য একটি জৈব দ্রাবকে অধিক দ্রবণীয় এবং জল ও ভাইরাসের ক্যাপসিড প্রোটিন উক্ত দ্রাবকে দ্রবণীয় নয়। উক্ত জৈব দ্রবণের সাথে ভাইরাস নিলম্বটি মিশিয়ে প্রবলভাবে ঝাকান হলে অপদ্রব্যগুলো জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে ভাইরাস নিলম্বন থেকে পৃথক হয়ে বেরিয়ে আসবে। ফ্লুরোকার্বন (flurocarbon), ডেক্সট্রান (dextran) ইত্যাদি জৈব দ্রাবক এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অন্তরিত (isolated) ভাইরাসের বিশুদ্ধতা

বিভিন্ন সময়সাপেক্ষ ও জটিল পদ্ধতিতে ভাইরাস নমুনা সংগৃহীত হওয়ার পর তা বিশুদ্ধ কিনা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, এর বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ভর করে পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনার সাফল্য।

কেল্লাস আকারে প্রাপ্ত একটি ভাইরাস নমুনাকে সাধারণত অতি বিশুদ্ধ মনে করা হয়। কিন্তু এতেও কিছু অবিশুদ্ধতা থাকা অসম্ভব নয়। এতে দু'রকমের অবিশুদ্ধতা থাকতে পারে—রাসায়নিক ও জৈব। রাসায়নিক অবিশুদ্ধতা সাধারণত রাসায়নিক পদ্ধতিতেই অপসারণ করা হয়। ভাইরাস প্রস্তুতির (preparation) সংক্রমণ ক্ষমতা হারানোকেই বলা হয় জৈব অবিশুদ্ধতা। ভাইরাসের অন্তরণ ও বিশুদ্ধি প্রক্রিয়ার সকল স্তরেই এর সংক্রমণ ক্ষমতা হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রতি পর্যায়েই তা পরীক্ষা ও উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে।

খ. ভাইরাস আবাদ (Virus culture)

ভাইরাস গবেষণার ক্ষেত্রে আবাদ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পর্যায়। কিন্তু ভাইরাসকে কোষমুক্ত কোনো মাধ্যমে (medium) আবাদ করা যায় না। এর আবাদের জন্য প্রয়োজন জীবিত কোষ। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, নির্দিষ্ট জীবিত কোষ। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পোষক কোষেই এর আবাদ করা সম্ভব। একটি ব্যাকটেরীয় ভাইরাস আবাদের জন্য নির্দিষ্ট জীবিত ব্যাকটেরিয়াই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণিভাইরাস উৎপাদনের জন্যও মাধ্যম হিসেবে প্রয়োজন যথাক্রমে নির্দিষ্ট জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ।

বিজ্ঞানী টর্ট ও ডিহেরেলে (১৯১৫–১৬ সালে) মৃত্তিকাবাসী ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করার সময় লক্ষ্য করেন, কোন কোন আবাদ পাত্রে তাদের ব্যাকটেরীয় আবাদ কোন অদৃশ্য বস্তুর প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে (চিত্র ১.২)। ওটি আসলে ছিল ভাইরাসের উৎপাদন। টর্টও তা অনুমান করেছিলেন। তাই তিনি এর নাম দেন, ব্যাকটেরীয়ফাজ বা ব্যাকটেরিয়াভুক। ভাইরাস উৎপাদনে এর পরেই শুরু হয়, জীবিত টিসুর ব্যবহার যেমন—মুরগির ভ্রূণোৎপন্ন ডিম, ইঁদুরের ফুসফুস, পরীক্ষামূলক পশু ইত্যাদি। পরিকল্পিত উদ্যোগে আবাদকৃত টিসু-মাধ্যমে সর্বপ্রথম সফলভাবে ভাইরাসের আবাদ করেন এন্ডার্স, ওয়েলার ও রবিন্স (১৯৪৯)। বর্তমানে ভাইরাস আবাদের জন্য কোষের 'ইনভিট্রো' (পরখ নলে বা প্রেট্রিপ্লেটে) উৎপাদন একটি নিয়মিত ব্যাপার।

জীবকোষের 'ইনভিট্রো' আবাদ নানাভাবে করা যায়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, টিসু এবং কোষ এজন্য ব্যবহৃত হয়। এক সময় জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ আবাদের প্রচলন ছিল। বর্তমানে বিশেষ কারণ ছাড়া এটি আর করা হয় না। যেমন, কিছু সংখ্যক শ্বাসরোগ ভাইরাস ফুসফুস টিসু ছাড়া উৎপন্ন হয় না। তাই এদের জন্য ফুসফুসের অংশবিশেষ চাষ করা হয়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের চূর্ণিত অংশও চাষের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত হত, যাকে বলা হত টিসু চাষ (tissue culture)। বর্তমানে এরও প্রচলন নেই বললেই চলে। 'ইনভিট্রো' আবাদের জন্য এখন একক কোষের আবাদই (cell culture) সাধারণ রীতি।

কোষ আবাদ পদ্ধতি

১. **কোষ সংগ্রহ :** নির্বাচিত ভাইরাস আবাদের জন্য নির্দিষ্ট পোষকের দেহ থেকেই কোষ সংগ্রহ করতে হয়। দেখা গেছে, উদ্ভিদের পেরেনকাইমা কোষ এবং প্রাণীর পেশি-উপাস্তক (muscle epithelium) ও যোজক কোষ (fibroblast) অধিকতর চাষোপযোগী।

২. **চূর্ণকরণ** : সংগৃহীত টিসুকে সমসত্ত্বকর (homoginizer) যন্ত্রের সাহায্যে অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে নিতে হবে।

৩. **ধৌতি** : খণ্ডিত টিসুসমষ্টিকে বিশেষভাবে তৈরি নির্বীজ (sterile) ধৌতি দ্রবণ[৪] দ্বারা ধুয়ে নিতে হয়। ধৌতি দ্রবণ হিসেবে সাধারণত (ক) হাংকের সুসম দ্রবণ, (খ) আর্লের সুসম দ্রবণ এবং (গ) সাধারণ লবণ দ্রবণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৪. **ট্রিপসিনিকরণ** : ধৌত টিসু খণ্ডগুলোতে ট্রিপসিন প্রয়োগ করে ৪° সে. তাপে নির্দিষ্ট সময় (১৮ ঘন্টা প্রায়) রেখে দেয়া হয়। কোষগুলোর মধ্যবর্তী সংযোগ (cementing) স্তরের মধ্যে প্রোটিনজাতীয় উপাদান থাকে। প্রোটিন বিগলক এনজাইম ট্রিপসিনের প্রভাবে প্রোটিন গলে গেলে কোষগুলো একক কোষ হিসেবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর কোষগুলোকে অপকেন্দ্রিত (centrifuge) করে কয়েক বার ধুয়ে উপযুক্ত মাধ্যমে নিলম্বিত করা হয়। এভাবে সংগৃহীত একক কোষসমষ্টি জীবাণুর মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কোষ আবাদের জন্য এ কোষ নিলম্বনই প্রবিষ্টা (inoculum) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫. **আবাদ মাধ্যম**[১] (Culture medium) : বিভিন্ন জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে এমন একটি পুষ্টি দ্রব্য তৈরি করা হয় যা কোষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদানের একটি সুষম সমাবেশ। এ পর্যন্ত অনেক মাধ্যম তৈরি হয়েছে। ইগলের (Eagle) তৈরি নিম্নোক্ত মাধ্যমটি একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে বিবেচিত। নির্ধারিত পরিমাণ লবণ, গ্লুকোজ, ভিটামিন, কো-এনজাইম, এমিনো এসিড, রক্তরস (blood serum) এবং একটি জীবাণুরোধক (antibiotic) পাতিত জলে দ্রবীভূত করে এ মাধ্যম তৈরি হয়। একটি বাফারের (buffer) সাহায্যে এর pH ৭.৪-এ স্থির রাখা হয়।

৬. **তাতোপ্তি** (Incubation) : পরখনল (test tube), কোণাকার পাত্র (conical flask), সমতলা পাত্র (flat bottom flask) পেট্রিপ্লেট ইত্যাদি যেকোনো উপযুক্ত পাত্রে আবাদ মাধ্যম পরিমাণ মতো ঢেলে নিতে হয়। অতঃপর পরিমিত মাত্রায় পূর্বপ্রস্তুত (১-৪ দ্র.) কোষ নিলম্বন আবাদ পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট (inoculate) করিয়ে মাধ্যমের সংস্পর্শে রেখে পাত্রটি একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বৃদ্ধি সহায়ক নির্দিষ্ট তাপে (সাধারণত ৩৬° সে.) রেখে দিতে হয়। একে তাতোপ্ত (তাত=উত্তাপ, উপ্তি=বপন) করা বলে। তাতোপ্তি প্রকোষ্ঠে

---

৪. ধৌতি দ্রবণ :

(ক) হাংকের (Hunk) সুসম দ্রবণ—NaCl, $NaHPO_4$, $NaHCO_3$, KCl, KH_2PO_4, $CaCl_2$, Glucose ও Phenol red বিভিন্ন নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাণে নির্দিষ্ট পরিমান পাতিত (distilled) জলে দ্রবীভূত করে তৈরি হয়।

(খ) আর্লের (Earle) সুসম দ্রবণ—Nacl, NaH_2PO_4, $NaHCO_3$, $CaCl_2$, KCl, $MgSO_4$ এবং Glucose বিভিন্ন নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমানে নির্দিষ্ট পরিমান পাতিত জলে দ্রবীভূত করে এ দ্রবণ তৈরি হয়।

১. উদাহরণস্বরূপ একটি নিদর্শ্য (typical) আবাদ মাধ্যমে ব্যবহার্য উপকরণগুলোর নাম উল্লেখ করা হল—গো রক্তরস, জলান্বিত ল্যাক্টালবুমিন, $NaHCO_3$, হাংকের সুসম দ্রবণ ও একটি জীবাণুরোধক।

(incubation chamber) সাধারণত ৭২ ঘন্টার মধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যক নতুন কোষ উৎপন্ন হয়।

কোষ আবাদের প্রকারভেদ

১. **প্রাথমিক আবাদ** : আবাদ পাত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ (প্রবিষ্ঠা হিসাবে ব্যবহৃত) থেকে সরাসরি উৎপন্ন কোষ সমষ্টিকে প্রাথমিক আবাদ বলে। প্রাথমিক আবাদের অধিকাংশ কোষই সাধারণত স্বল্পজীবী। তবে এতে বহু প্রজাতির কোষ থাকে এবং এতে বহু প্রকারের ভাইরাস উৎপাদন করা যায়। বানরের বৃক্ক (kidney) মানব ভ্রূণ, বৃক্ক ও ভ্রূণাবরণ, মুরগি ও ইদুরের ভ্রূণ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন প্রাথমিক আবাদ গবেষণাগারে নানা পরীক্ষামূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

২. **ডিপ্লয়েড কোষ জাতক** (Deploid cell strain) : প্রাথমিক আবাদ থেকে উৎপন্ন কোষ সমষ্টিকে ডিপ্লয়েড কোষ জাতক বলা হয়। এরা সর্বদা ডিপ্লয়েড প্রকৃতি রক্ষা করে এবং সাধারণত পুনপুন বিভাজন সক্ষম।

৩. **ক্লোন** (Clone) : একটি নির্দিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন কোষ থেকে উৎপন্ন কোষসমষ্টিকে ক্লোন বলে। মানবকণ্ঠক্যান্সার থেকে উৎপন্ন হেলা কোষ (hela cell) এরূপ একটি ক্লোন সম্বন্ধ। ক্লোন আবাদের প্রতিটি কোষ সর্বতোভাবে (in all respect) একই প্রকারের।

৪. **স্থায়ী কোষ ধারা** (Parmanent cell line) : ডিপ্লয়েড কোষ থেকে উৎপন্ন নিয়ত (continuously) বর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্লোন আবাদকে স্থায়ী কোষ ধারা বলা হয়। সাধারণত স্থায়ী ক্যান্সারকোষ থেকে এবং ক্রোমোজোম অপেরণের (aberration) মাধ্যমে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে।

৫. **একস্তর আবাদ** (Monolayer culture) : প্রবিষ্ট (inoculated) কোষসমূহ আবাদপাত্রে তরল মাধ্যমের তলদেশে স্থির হয়ে জমে থাকে। তা থেকে নতুন কোষ উৎপন্ন হলে তা পাত্রের তলদেশে এক কোষ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি অখণ্ড কোষের স্তর উৎপন্ন করে, একে একস্তর আবাদ বলে। মার্কিন বিজ্ঞানী ডালবিকো ও তাঁর সহযোগীগণ কঠিন আগার মাধ্যমের পৃষ্ঠে (surface) এক স্তর আবাদ তৈরি করতে সক্ষম হন। এ আবাদ প্রাণিভাইরাস গবেষণার জন্য খুব উপযোগী। সাধারণভাবে এক স্তর আবাদে ভাইরাসের সুসম বৃদ্ধি হয় বলে ভাইরাস গবেষণায় এর উপযোগিতা ও ব্যবহার সর্বাধিক।

৬. **নিলম্বন আবাদ** (Suspension culture) : তরল মাধ্যমে প্রবিষ্টাসহ (inoculem) একটি আবাদ পাত্র কম্পক যন্ত্রে (shaker) স্থাপন করে সর্বক্ষণ কম্পিত অবস্থায় তাতোপ্ত (incubate) করা হলে বৃদ্ধিশীল কোষগুলো কোথাও ঘনসমাবেশ তৈরি করে না, সমস্ত মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একে নিলম্বন আবাদ বলে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের কোষাবাদ বিভিন্ন বিশেষ ধরনের ভাইরাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

[illegible] : কয়েকটি কোষাবাদের ধারা, উৎস, প্রকার ও ব্যবহার

[illegible]	ধারা	উৎস	প্রকার	ব্যবহার
	HA	মানব ভ্রূণাবরণ	মিশ্র	এডেনো, রিও, রুবেলা, ভেরিসেলা, ভেকসিনিয়া ইত্যাদি ভাইরাস অন্তরণ ও সংরক্ষণ।
[illegible]	CE	মুরগির ভ্রূণ	মিশ্র	হার্পিস, ফ্লু, বসন্ত ইত্যাদি ভাইরাসের অন্তরণ ও সংরক্ষণ।
	AGMK	আফ্রিকান সবুজ বানর বৃক্ক	মিশ্র	এডেনো, হার্পিস, ফ্লু, হাম, পলিও ইত্যাদি ভাইরাসের অন্তরণ ও সংরক্ষণ।
	Hela	মানব কণ্ঠক্যান্সার কোষ	বহিস্তুক	মানব ভাইরাসসমূহের অন্তরণ ও সংরক্ষণ।
[illegible]	3T3	ইঁদুর ভ্রূণ	যোজকতন্তু	অংকো ভাইরাসসৃষ্ট রূপান্তর পরিমাপ।
	L	ইঁদুরের যোজক টিস্যু	যোজকতন্তু	হার্পিস, ফ্লু ও হাম ভাইরাসের অন্তরণ ও সংরক্ষণ।
	WI38	মানব চর্ম	যোজকতন্তু	অধিকাংশ মানব ভাইরাসের অন্তরণ সংরক্ষণ ও প্রতিষেধক প্রস্তুতি।

[... F. Norton এবং Fenner & White-এর সাহায্যে]

ভাইরাস আবাদ

[illegible]নের জন্য নির্দিষ্ট ভাইরাসকে এর পোষকের দেহ থেকে অন্তরিত করে উপযুক্ত মাধ্যমে [illegible] তৈরি করে নিতে হয়। উক্ত ভাইরাসের উৎপাদনোপযোগী নির্দিষ্ট পোষক টিস্যু থেকে [illegible] ধরনের কোষাবাদ (cell culture) আগেই তৈরি করে রাখতে হবে। নি[illegible] ভাইরাসটি কোষাবাদের উপর ছড়িয়ে দিয়ে অথবা মাধ্যমের সাথে মিশিয়ে দিয়ে প্রবিষ্ট করা [illegible] পারে। অতঃপর তাপোপ্তি (incubation) প্রকোষ্ঠে নির্দিষ্ট তাপে রেখে দিলে নির্দিষ্ট [illegible] পরে ভাইরাসের আবাদ পাওয়া যাবে।

[illegible] টিসু ও দেহে ভাইরাস আবাদ

[illegible] সালের পূর্বে অনেক ভাইরাস উৎপাদনের জন্যই মুরগির ভ্রূণোৎপন্ন ডিম ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানী গুড পাস্তুর (Good Pasture) এবং এর সফল [illegible] করেন বিজ্ঞানী বার্নেট। তখনকার জানা প্রায় সব ভাইরাসই সে সময় মুরগিভ্রূণের [illegible] না কোনো বিল্লীর উপর উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

ডিমের খোলকের (shell) মধ্যে এর প্রশস্ত প্রান্তের দিকে একটি বায়ু কুঠরি [illegible] [illegible] হওয়ার ৪ থেকে ১২ দিন পর বায়ু কুঠরির উপর দিয়ে খোলকটি কেটে ফেলতে হয়।

এরপর নির্দিষ্ট ঝিল্লী সংলগ্ন তরলের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাইরাস প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে হয় (চিত্র ২.৪)। ২ থেকে ৫ দিন তাত্ত্বোপ্তির পরই ঝিল্লীর উপর ভাইরাসের উৎপাদন দেখা দেয়। বর্তমানে ভাইরাস উৎপাদনের জন্য ডিমের ব্যবহার আর হয় না বললেই চলে। তবে কয়েকটি ভাইরাস, যেমন—ফ্লু, এতে এতোই ভাল উৎপন্ন হয় যে, এদের সম্পর্কিত সব কাজেই (টীকা উৎপাদন ও অন্যান্য গবেষণা ইত্যাদি) ডিম ব্যবহৃত হয়।

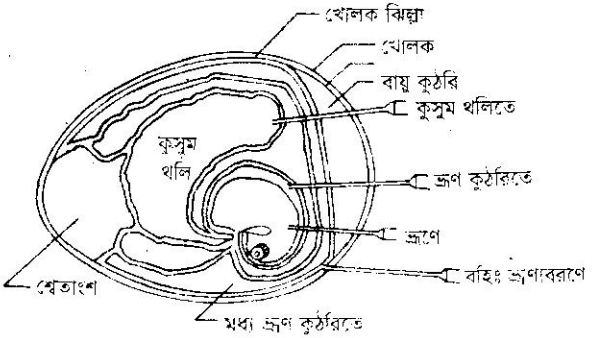

চিত্র ২.৪ : ভ্রূণ উৎপন্ন ডিমে ভাইরাস প্রবিষ্টকরণ।

গবেষণাগারে ভাইরাস উৎপাদনের জন্য এক সময় জীবন্তপ্রাণী ব্যবহার করা হত। সে প্রচলনও আজকাল প্রায় নাই। তবে আরবো (arbo) ভাইরাস উৎপাদনের জন্য ইঁদুর শাবক এবং কিছু সংখ্যক মানব ভাইরাসের গবেষণায় প্রাইমেটের ব্যবহার এখনও আছে।

অবশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যেকোনো আবাদ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে অবশ্যই নির্বীজ (sterile) অবস্থা বজায় রাখতে হবে। ভাইরাস ও কোষ আবাদের যে মৌলিক ও সাধারণ পদ্ধতি এ অধ্যায়ে বর্ণিত হলো, ক্ষেত্রবিশেষে এবং প্রয়োজনবোধে অবশ্যই এর পরিবর্তন ও সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।

গ. ভাইরাস পরিশীলন (Virus study)

একটি নির্দিষ্ট ভাইরাসকে এর পোষক থেকে অন্তরিত (isolate) করে যথাযথ কোষ বা টিসু মাধ্যমে সফলভাবে আবাদ করা সম্ভব হলে এর সম্পর্কে অন্যান্য গবেষণার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ভাইরাস পরিশীলনের পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ এ রকম হতে পারে—

১. ভাইরাস অনুমাপন (assay),
২. ভাইরাস পর্যবেক্ষণ (observation),
৩. তলানি বিশ্লেষণ (sediment analysis),
৪. রাসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

১. ভাইরাস অনুমাপন (Assay) : পরিমাপ ব্যবস্থা যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাইরাসের ক্ষেত্রে একটি নিলম্বনে উপস্থিত ভাইরাসের সংখ্যা

... নিলম্বনের সংক্রামিতার (infectivity) পরিমাণ (তথা উপস্থিত ভাইরাসের ... ক্ষমতা) দুটোই পরিমাপযোগ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। সংখ্যা নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ... (enumeration) এবং সংক্রামিতার পরিমাপন প্রক্রিয়াকে বলা হয় টাইট্রেশন। নির্দিষ্ট ... (একক পরিমাণ) সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের পরিমাণকে বলা হয় টাইটার ...।

২.১. সংখ্যা গণনা (Enumeration) : নিলম্বনে উপস্থিত ভাইরাসের সংখ্যা নির্ণয়ের ... নানা পদ্ধতি রয়েছে, যথা—

২.১.১. ভৌত (Physical) **পদ্ধতি**—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ভাইরাস কণার সংখ্যা সহজেই গুণে নেয়া যায়। একটি জানা ঘনমানের ভাইরাস নিলম্বনকে একটি জানা ঘনত্বের ...স্টারিন লেটেক্স কণার সাথে মিশিয়ে একটি সেলোফিন ফিল্মের (cellophane film) উপর ছড়িয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফটো নিয়ে ... থেকে ভাইরাস কণার সংখ্যা গুণে নিতে হবে। চিত্রে (চিত্র ২.৫, একটি ইলেকট্রন ...ক্ষণিক চিত্র থেকে অঙ্কিত রেখাচিত্র) ২২০টি ছোট ও ১৭টি বড় কণা দেখা যাচ্ছে। বড়গুলো লেটেক্স কণা ও ছোটগুলো ভাইরাস কণা। যেহেতু লেটেক্সের ঘনত্ব ছিল প্রতি মিলিলিটারে ৩.২×১০^{১০}টি কণা, সেহেতু ভাইরাসের ঘনত্ব হবে প্রতি মিলিলিটারে $২২০/১৭ \times ৩.২ \times ১০^{১০} = ৪.১ \times ১০^{১১}$টি কণা। অবশ্য এ পদ্ধতিতে সংক্রামী ও অসংক্রামী সকল কণাই সমভাবে গণিত (counted) হয়। ভাইরাস আস্তরিত ফিল্মে ধাতব ছায়াপাত (metal shadowing) করা হলে আরও সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণ ও সঠিকতর গণনা সম্ভব (চিত্র ২.১০)।

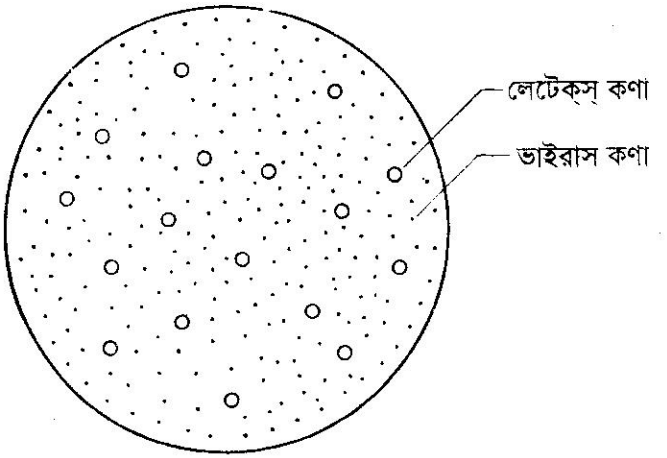

চিত্র ২.৫ : ভাইরাস গণনার ভৌত পদ্ধতি।
[চিত্র বিশ্লেষণ : ২২০টি ছোট ও ১৭টি বড় কণা দেখা যাচ্ছে। বড় গুলো লেটেক্স কণা ও ছোটগুলো ভাইরাস কণা। লেটেক্সের ঘনত্ব জানা। তা ছিল প্রতি মিলি লিটারে (মিলি) ৩.২×১০^{১০}টি কণা। যেহেতু ভাইরাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব জানা, সেহেতু প্রতি মিলি নিলম্বনে ভাইরাসের সংখ্যা $= ২২০/১৭\times৩.২\times১০^{১১} = ৪.১\times১০^{১০}$টি।]

১.১.২. রক্ততঞ্চন (Hemaglutination) **পদ্ধতি :** অনেক ভাইরাস লাল রক্ত কণিকা জমিয়ে দিতে পারে। হার্স্ট (Harst) ফ্লু ভাইরাসের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন (১৯৪৩)। ফ্লু ভাইরাসের প্রাবরণে (envelope) যে গ্লাইকোপ্রোটিন রয়েছে তার সাথে লোহিত কণিকার গ্লাইকোপ্রোটিনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটার ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্যারামিক্সো ভাইরাসের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটে। যেসব ভাইরাসের প্রাবরণে নুরামিনিডেজ এনজাইম (enzyme) থাকে তাদের ক্ষেত্রে রক্ত জমে না, কারণ এ এনজাইম লোহিত কণিকার গ্লাইকোপ্রোটিন নষ্ট করে দেয়। আবার যখন তাপ ৪° সে.-এর কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয় তখন এ উৎসেচক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, ফলে এ ধরনের নিম্নতাপে ঐসব ভাইরাসের ক্ষেত্রেও রক্ত জমতে দেখা যায়। নিলম্বনে ভাইরাসের ঘনত্ব বেশি থাকলেই এ পদ্ধতি কার্যকর হয়। পরিমাণে অল্প ভাইরাসের উপস্থিতি জ্ঞাপক সূক্ষ্ম পদ্ধতি এটি নয়। অনেক গবেষণাগারেই এ পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।

ভাইরাস নিলম্বনকে পর্যায়ক্রমে তরল করে (১:১০, ১:১০০ ইত্যাদি) ছোট গোলতলা পাত্রে, যথাক্রমে সাজিয়ে প্রতিটিতে লোহিতকণিকা যুক্ত করে কয়েক ঘন্টা রেখে দেয়া হয়। অতঞ্চিত লোহিত কণিকা পাত্রের তলদেশে জমে এবং তঞ্চিত লোহিত কণিকাগুলো তার চতুর্দিকে একটি পাতলা আবরণ তৈরি করে (চিত্র ২.৬)।

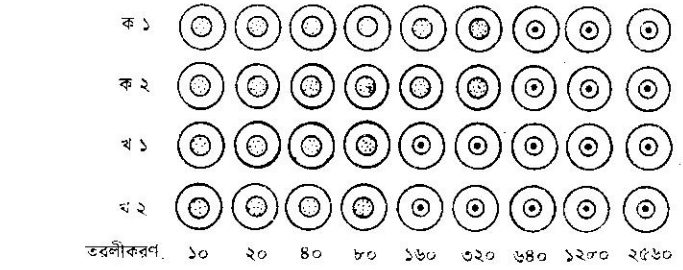

চিত্র ২.৬ : রক্ত তঞ্চনের হার অনুমাপনের সাহায্যে ভাইরাস গণনা।

[চিত্র বিশ্লেষণ : দুটি রক্তের নমুনা ক ও খ। ১০, ২০, ৪০ ৮০, ১৬০ এরূপ অনুক্রমে দুটোকেই তরল করা হয়েছে। প্রতিটি তরলীকরণ (dilution) ৫ মিলি মাত্রার সাথে সমপরিমাণ লোহিত রক্ত কণিকার নিলম্বন (১০^{৭}/মিলি) মিশ্রিত করে চিত্রের মতো বিন্যাসে ছোট ছোট প্লাস্টিক পাত্রে তরলীকরণের ক্রমানুসারে ঢেলে কক্ষ তাপে (room temperature) ৩০ মিনিট রেখে দেয়া হল। দেখা গেল, নমুনাটি তঞ্চিত হয় ৩২০ তরলীকরণের পর্যায়ে। অর্থাৎ উপস্থিত লোহিত কণিকাগুলোর তঞ্চিত হবার জন্য যতো ভাইরাস প্রয়োজন এতে ঠিক ততোসংখ্যক ভাইরাস রয়েছে নিলম্বনে লোহিত কণিকার সংখ্যা ছিল ১০^{৭} (প্রমিত তরলীকরণ রূপে প্রস্তুত); যেহেতু একটি ভাইরাস দুটি লোহিত কণিকাকে তঞ্চিত করতে পারে (জানা), সেহেতু ক নমুনায় ভাইরাসের সংখ্যা = ৩২০×৫×১০^{৬} এবং খ নমুনায় ভাইরাসের সংখ্যা = ৮০×৫×১০^{৬}। অবশ্য ব্যবহারিকভাবে সরাসরি রক্ত তঞ্চনের একক দ্বারাই ভাইরাসের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নমুনা ক-তে ৩২০ খ-তে ৮০ ভাইরাস উপস্থিত।

.২. সংক্রামিতা পরিমাপ (Titration) : কি পরিমাণ ভাইরাস নিলম্বন পোষক দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা থেকেই এর সংক্রমিতা পরিমাপ করা হয়। ভাইরাসের পরিমাপ প্রক্রিয়াই টাইট্রেশন এবং একটি নিলম্বনে সুনির্দিষ্ট সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের পরিমাণকে বলা হয় টাইটার (titer)। ভাইরাস টাইট্রেশনের অনেক পদ্ধতি ... যেমন—

.২.১. ফাজ, প্লেক পদ্ধতি (Plaque) : ডিহেরেলে সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিতে ব্যাকটেরীয় ... পরিমাপ করেন। পদ্ধতিটি এরকম. একটি ফাজ নিলম্বন (suspension), পোষক ব্যাকটেরিয়ার উৎপাদনসহ এক ফোটা আবাদ মাধ্যম এবং কয়েক মিলি লিটার গলান ... তপ্ত) আগার একসাথে মিশিয়ে একটি পেট্রিপ্লেটে শক্ত জমানো আগারের উপর ... দেয়া হয়। মিশ্রণটি পাতলা স্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্লেটকে তাতোপ্ত (incubate) ... হলে যখন একটি সুষম ব্যাকটেরীয় লন উৎপন্ন হয়, তখন মিশ্রণস্থিত ফাজের সংক্রমণ শুরু হয়। প্রতিটি ফাজ নিকটবর্তী ব্যাকটেরিয়া কোষ আক্রমণ করে ও ২০ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে কয়েক শত ফাজ ব্যাকটেরিয়া কোষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে এবং এরা ... নিকটতম ব্যাকটেরিয়া কোষগুলো আক্রমণ করে। এরকম চলতে থাকে এবং ...দিনের তাতোপ্তির পরই ব্যাকটেরীয় লনে ব্যাকটেরীয়া ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট স্বচ্ছ প্লেকগুলো খালি চোখেই দেখা যায় (চিত্র ২.৭)।

চিত্র ২.৭ : ফাজ অনুমাপন—প্লেক পদ্ধতি।

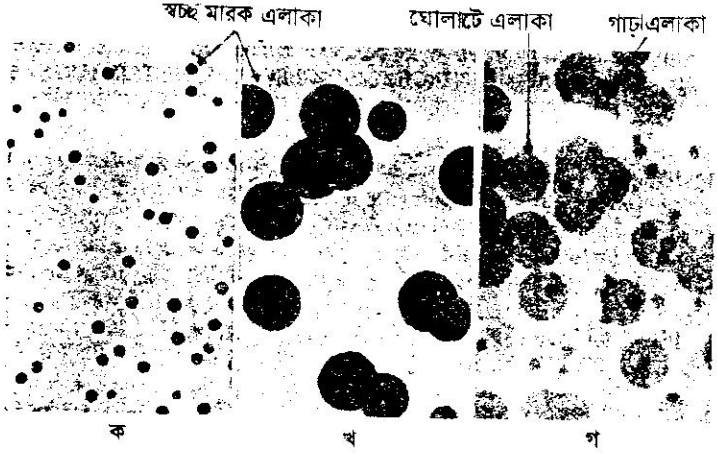

[চিত্র বিশ্লেষণ : প্লেটে বিভিন্ন নির্দেশক (indicator) ব্যাকটেরীয় মাধ্যমে ফাজ T1 ও T2 মিশ্রণের আবাদ করা হয়েছে। (ক) নির্দেশক ক T2 এর সুবেদী (sensative) (খ) নির্দেশক খ T1 এর সুবেদী (গ) নির্দেশক ক ও খ এর মিশ্রণে উভয় ফাজ ঘোলাটে প্লেক উৎপন্ন করে। তবে যেখানে একে অপরকে অতিক্রম (overlap) করে সেখানে স্বচ্ছ মারক (lytic) এলাকা সৃষ্টি হয়]

১.২.২. প্রাণিভাইরাস, প্লেক পদ্ধতি : ডালবিকো ও ডিহেরেলে উপরোক্ত পদ্ধতিটির একটু পরিবর্তন করে প্রাণিভাইরাস পরিমাপের এ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। কাঁচের পৃষ্ঠে উৎপন্ন একটি একস্তর আবাদে ভাইরাস নিলম্বন ঢেলে দেয়া হয়। ১–২ ঘণ্টা পর ভাইরাস কণাগুলো কোষের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। তখন এর উপর আবার নরম (৪৪° সে. তপ্ত) আগার অথবা জেল মিশ্রণ ঢেলে দেয়া হয়। ১–৩ সপ্তাহ তাতোপ্ত করার (incubate) পর এতে সুস্পষ্ট প্লেক দেখা যায় (চিত্র ২.৮)।

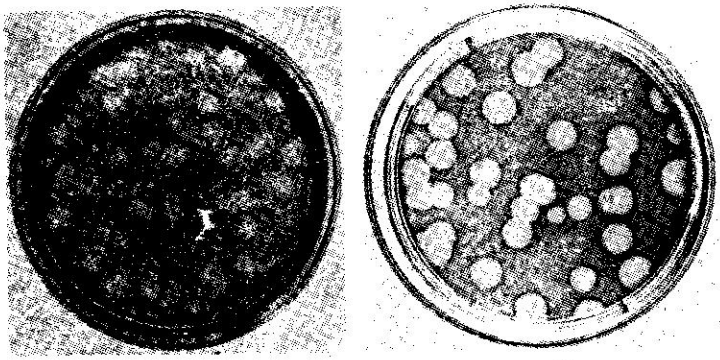

ক খ

চিত্র ২.৮ : প্লেক অনুমাপন পদ্ধতি—প্রাণিভাইরাস গণনার জন্য। (ক) মুরগির তন্তুকোষে উৎপন্ন Western equine encephalitis ভাইরাসের প্লেক এবং (খ) মানব হেলা কোষে পলিও ভাইরাসের প্লেক।

১.২.৩. প্রাণিভাইরাস, পোক পদ্ধতি : মুরগির ভ্রূণাবরণে ভাইরাস সংক্রমণ করা হলে ভাইরাস ভেদে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রোগ চিহ্ন সৃষ্টি হয়। এসব চিহ্নকে পোক (pock) বলা হয়। বসন্ত ভাইরাস পরিমাপের জন্য বার্নেট পোক গণনাপদ্ধতি ব্যবহার করেন (চিত্র ২.৯)। অন্য দু'একটি ভাইরাস, যেমন হার্পিস পরিমাপের জন্যও পোকপদ্ধতি সুবিধাজনক।

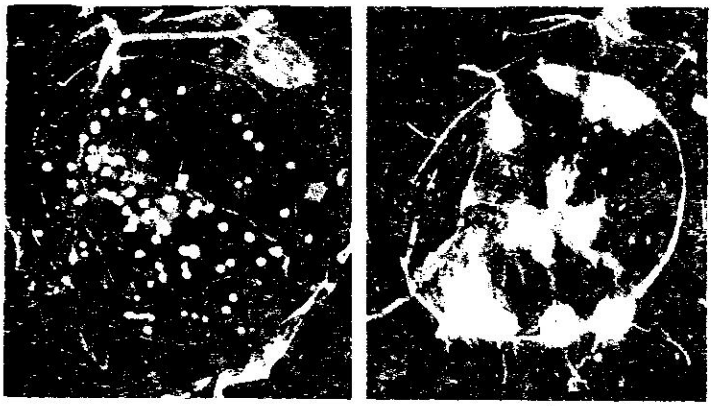

ক খ

চিত্র ২.৯ : পোক অনুমাপন পদ্ধতি—প্রাণিভাইরাস গণনার জন্য। মুরগি-ভ্রূণের chorio-allantoic ঝিল্লীতে (ক) ভেরিওলা ভাইরাসের পোক এবং (খ) ভেকসিনিয়া ভাইরাসের পোক।

ভাইরাস পর্যবেক্ষণ

শুদ্ধ ভাইরাস নমুনা সংগ্রহ করার পর এর ভৌত ও আণবিক গঠন পর্যবেক্ষণের জন্য ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

২.১. ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ (Electron microscopy) : আলোক অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ (resolution) ক্ষমতা ৪২৬ nm (ন্যানোমিটার)। অর্থাৎ দুটি পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব ৪২৬ nm-এর কম হলে আলোক অণুবীক্ষণে এদের পৃথক দেখা যাবে না। অন্যদিকে বৃহত্তম ভাইরাসের ব্যাসও ২৫০ nm-এর বেশি নয়, বরং অধিকাংশ ভাইরাসের ব্যাসই ১০০ nm-এর কম। তাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আলোক অণুবীক্ষণেও ভাইরাস দেখা সম্ভব হয়নি। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ০.৪–১.০ nm, অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের ব্যাসও ১০ nm-এর কাছাকাছি। তাই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ভাইরাসকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যায় পর্যন্ত দেখা সম্ভব হয়েছে। প্রথম দিকে ভাইরাস কণাসমূহ কোনো বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই সরাসরি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হতো, ফলে তখন খুব উঁচু মানের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ অর্জন সম্ভব হয়নি। বর্তমানে নানা বিশেষ পূর্ব প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাইরাসকে ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি করে নেয়া হয়। ফলে এর আকার, পৃষ্ঠগঠন, অন্তর্গঠন ইত্যাদি যথেষ্ট স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাস পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত বিশেষ ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক প্রযুক্তিগুলো নিম্নরূপ—

২.১.১. ধাতব ছায়াপাত (Metal shadowing) : একটি স্বচ্ছ ঝিল্লীর উপর ভাইরাস নিলম্বন (suspension) ছড়িয়ে দিয়ে শুকিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট কৌণিক অবস্থানে

থেকে একটি ধূমায়মান ধাতুর (যেমন স্বর্ণ) বাষ্প-এর উপর নিক্ষেপ করা হয়। এতে ভাইরাস কণাগুলোর এক পার্শ্ব একটি ইলেকট্রন-অনচ্ছ (opaque) ধাতব প্রলেপে ঢেকে যায় (চিত্র ২.১০)। কণাগুলোর উল্টো দিকে এ প্রলেপ না থাকাতে ঐদিক থেকে ইলেকট্রন রশ্মি পাত করা হলে সুস্পষ্ট ছায়ার সৃষ্টি হয়। এ ছায়ার পটভূমিতে (background) ভাইরাসের আকার ও আকৃতি (shape and size) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। উইলিয়াম ও উইকফ এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ভাইরাস কণার পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম অমসৃণতা থাকলে ধাতুর প্রলেপও অসমান হয়, যা ইলেকট্রন রশ্মীর জন্য অসমান অনচ্ছতা সৃষ্টি করে। ফলে এ পদ্ধতিতে ভাইরাস কণার পৃষ্ঠ গঠনও (surface structure) সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় (চিত্র ২.১০)।

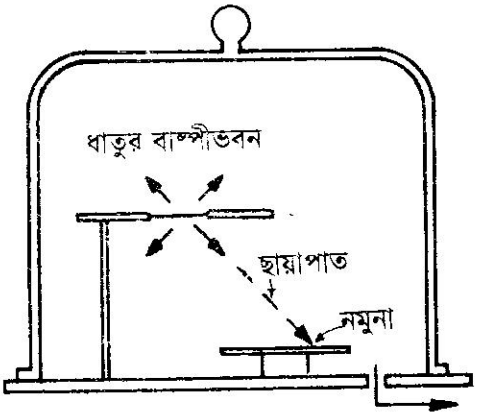

চিত্র ২.১০ : ধাতব ছায়াপাত।

২.১.২. ইতিরঞ্জন (Positive staining) : এমন কিছু বিশেষ ধরনের রঙিন রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে যা বিশেষভাবে ভাইরাস কণার নির্দিষ্ট সহাংশ দ্বারা নির্বাচিতভাবে (selectively) শোষিত হয় এবং অংশটি বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউরেনাইল এসিটেট ভাইরাস নিউক্লিক এসিডকে এবং ফেরেটিন ভাইরাস ক্যাপসিডকে রঞ্জিত করে। এ দুটি রসায়ন (chemical) দ্বারা রঞ্জিত করা হলে ইলেকট্রনবীক্ষণিক চিত্রে ভাইরাস কণার গঠন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে (চিত্র ২.১১)।

২.১.৩. নেতিরঞ্জন (Negative staining) : এ পদ্ধতিতে ভাইরাসকে একটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রন অনচ্ছ দ্রবণের সাথে মিশ্রিত করে তা একটি কলডিয়ন ঝিল্লীর উপর ছড়িয়ে দিয়ে শুকিয়ে নেয়া হয়। সোডিয়াম ফসফোটাংস্টেট, অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড ইত্যাদি এ ধরনের দ্রবণ। এ দ্রবণ ভাইরাস কণার চতুর্দিকে কলডিয়ন ঝিল্লীর উপর জমে এবং ঝিল্লীটি ইলেকট্রন অনচ্ছ (electron opaque) হয়ে যায়, অন্যদিকে ভাইরাস কণা দ্বারা অধিকৃত এলাকাগুলো ফাঁকা থাকে (চিত্র ২.১১)। তবে ভাইরাস পৃষ্ঠের খাঁজ ও অসমতল স্থানগুলোতেও কিছু দ্রবণ

ফলে এথেকে গৃহীত ইলেকট্রন বীক্ষণিক চিত্রে ভাইরাসের আকার আকৃতি ও গঠন সূক্ষ্মভাবে ধরা পরে। ব্রেনার ও হর্ণ সোডিয়াম ফসফোটাংস্টেট ব্যবহার করে প্রথম এ পদ্ধতিতে ভাইরাস পর্যবেক্ষণ করেন।

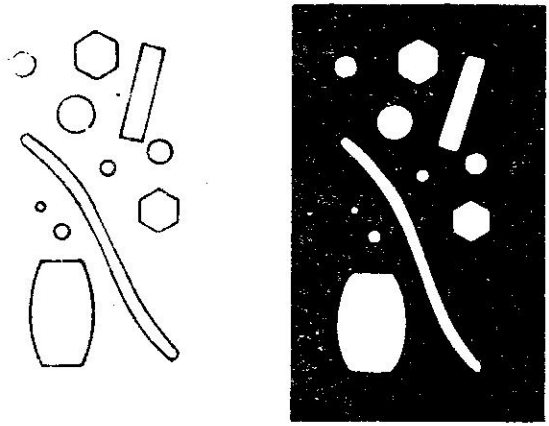

ইতি রঞ্জন নেতি রঞ্জন

চিত্র ২.১১ : ইতিরঞ্জন (posetive staining) ও নেতিরঞ্জন (negative statining)-- অঙ্কিত মডেল চিত্র।

২.১.৪. পাতলা ছেদন (Thin section) : ভাইরাস নিলম্বন সেন্ট্রিফিউজ করা হলে ভাইরাস ও অন্যান্য নিলম্বিত কণাসমূহ সেন্ট্রিফিউজনলের তলদেশে তলানি (sediment) হয়ে জমে। বটিকার (pillet) মত এ তলানি থেকে বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনেক পাতলা ছেদন (section) কেটে নেয়া হয়। এসব ছেদন ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ভাইরাসকণার সকল অংশের প্রায় সকল প্রকারে ও কোণে কর্তিত ছেদনই এসব ছেদনে খুঁজে পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণে ভাইরাস কণার আভ্যন্তরীণ গঠন ভাল বোঝা যায়।

২.২. এক্সরে কেলাসচিত্রন (X-ray crystallography) : যেকোনো কেলাসকণার মধ্যেই পারমাণবিক বিন্যাস অত্যন্ত সুশৃঙ্খল হয়ে থাকে। কেলাস কণার মধ্য দিয়ে এক্সরে পরিচালিত করা হলে আন্তঃপারমাণবিক ফাঁক দিয়ে এর একাংশ সরাসরি বেরিয়ে যাবে, বাকি অংশ পারমাণবিক অবস্থানসমূহে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিচ্ছুরিত (ভিন্ন পথে পরিচালিত) হবে। কেলাসের পারমাণবিক গঠন সুশৃঙ্খল বলে এক্স রশ্মির বিচ্ছুরণেও একটা বিশেষ শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়। ফটোগ্রাহক (photographic) কাগজে এ কেলাসের মধ্য দিয়ে পরিচালিত এক্স রশ্মির ছবি নেয়া হলে একটি সুশৃঙ্খল ছায়াচিত্র পাওয়া যায় (চিত্র ২.১২)। এ চিত্র বিশ্লেষণ করে কেলাসের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ভাইরাসকণাও

কেলাসাকার, এ পদ্ধতিতে অনেক ভাইরাস কণার গঠন সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (চিত্র ২.১১)।

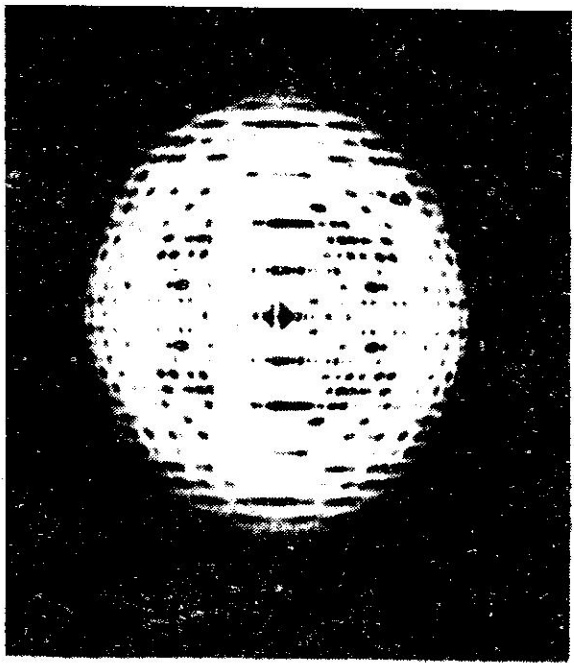

চিত্র ২.১২ : তামাকের মোজাইক ভাইরাসের এক্সরে বিস্ফুরণ (diffraction) চিত্র। [অধ্যাপক J.T. Finch এর সৌজন্যে।]

৩. তলানি বিশ্লেষণ (Sediment analysis)

যেকোনো তরল মাধ্যমে উপস্থিত নিলম্বিত (suspended) কণাসমূহ মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণে ওজনের ক্রমানুসারে ধীরে ধীরে তরলের তলদেশে থিতিয়ে পড়ে। এটি যেকোন কণাকার বস্তুর ভৌত গুণ। ভাইরাস কণা ও এর বিভিন্ন সহাংশের (components) ওজন ও অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্য নিরূপনের কাজে তলানি বিশ্লেষণের জন্য উক্ত ভৌত প্রপঞ্চটি সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক ভাইরাস ও এদের সহাংশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

৪. রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis)

ভাইরাস কণার রাসায়নিক সহাংশসমূহ, যথা—নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি প্রতিটিই জীবজগতের সুপরিচিত বৃহদাণু (macromolecule) ও জীবদেহের মৌলিক রাসায়নিক সহাংশ (component)। প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক পদ্ধতিতেই এগুলোর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাইরাস গঠনতত্ত্ব

ভাইরাস আকারে এতই ক্ষুদ্র যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বে এর গঠন সম্বন্ধে জানা সম্ভব ছিল না। সাধারণ হিসেবে একটি ভাইরাস কণার ব্যাস একটি ব্যাকটেরিয়া কোষের ব্যাসের ১/২০ থেকে ১/১০০ অংশ। আলোক অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ সীমার (২২৬ ন্যানোমিটার) বহু নিচে এর অবস্থান। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত বহু ভাইরাসবিদের গবেষণার ফলে ভাইরাসের রসায়নিক ও রোগাত্মক (pathogenic) চরিত্র সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানা সম্ভব হলেও প্রত্যক্ষভাবে ভাইরাস দর্শন সর্বপ্রথম সম্ভব হয় ১৯৪১ সালে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে। এর পর ব্রেনর, হর্ন, এন্ডারসন এবং আরো অনেক বিজ্ঞানী ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং ফলে ভাইরাসের গঠন অতি সূক্ষ্ম পর্যায় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

জীবদেহের গঠন সাধারণত তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করা হয়। যেমন– ভৌত গঠন, রাসায়নিক গঠন এবং আণবিক গঠন। আকারে ও গঠনে ভাইরাস একটি বৃহদণু (macromolecule)। এর ভৌত, রাসায়নিক ও আণবিক গঠন সম্পর্কিত আলোচনা পৃথক পৃথকভাবে করা সহজ নয়। তাই দ্বিরুক্তি এড়ানো ও বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি সমন্বিত বর্ণনায় ভাইরাসের গাঠনিক পর্যায়গুলো আলোচিত হয়েছে।

কয়েকটি পরিশব্দ

ভাইরাস ক্ষুদ্রতম জীবিত অস্তিত্ব (entity)। পোষক কোষের বাইরে এর দেহ যেন জড় রাসায়নিক কেলাস (crystal)। সে জন্য একে প্রায়শ ভাইরাস কণা (particle) বলে অভিহিত করা হয়। প্রধানত দুটি মহাংশ (component parts) দ্বারা ভাইরাস কণা গঠিত। নিউক্লিক এসিড গঠিত কোর (core) ও এর চতুর্দিকে প্রোটিন গঠিত আবরণ ক্যাপসিড (capsid)। ক্যাপসিড গঠিত হয় বহুসংখ্যক প্রোটিন উপএকক (subunit) দ্বারা, এদের বলা হয় প্রোটোমার (protomer)। কোনো কোনো ভাইরাসে কয়েকটি প্রোটোমার একত্রিত হয়ে প্রথম পর্যায়ে একটি বৃহত্তর উপএকক তৈরি করে। একে বলে ক্যাপসোমার (capsomer) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেক ক্যাপসোমার বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়ে তৈরি করে ক্যাপসিড। অনেক প্রাণিভাইরাসে ক্যাপসিডের চতুর্দিকে একটি অতিরিক্ত আবরণ থাকে। একে প্রাবরণ (envelope) বলে। এটি একটি লিপোপ্রোটিন (লিপিড ও প্রোটিন নির্মিত) আবরণ। প্রাবৃত (enveloped) ভাইরাসের ক্ষেত্রে কোর ও ক্যাপসিডকে যুক্তভাবে নিউক্লিওক্যাপসিড (nucleocapsid) বলা হয়। অনেক সময় (প্রাবৃত ভাইরাসের ক্ষেত্রেই) সম্পূর্ণ নিউক্লিও

ক্যাপসিডকেও কোর বলে অভিহিত করা হয়। ভাইরাসতত্ত্বে ভাইরাস শব্দটি একটি সাধারণ পরিশব্দ (term)। বিশেষভাবে সংক্রমণ সক্ষম ভাইরাসকে বলা হয় ভাইরিয়ন (virion)।

ভাইরাসের আকারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

ভাইরাসের আকার (shape) নির্ভর করে ক্যাপসিডের আকারের উপর, আর ক্যাপসিডের আকার নিয়ন্ত্রিত হয় প্রোটোমার ও ক্যাপসোমারের বিন্যাস বা সমাবেশ (symmetry) দ্বারা। ক্যাপসিডের বিন্যাসভেদে ভাইরাস হতে পারে তিন প্রকার, যথা—১. দণ্ডাকার (rod shaped) বা সর্পিল সমাবেশ (helical symmetry), ২. আপাতবর্তুলাকার (quasi-spherical) বা বিংশতল (icosahedral) সমাবেশ এবং ৩. বেঙাচি আকারের (tadpole shaped) বা দ্বৈত (binal) সমাবেশ।

১. দণ্ডাকার বা সর্পিল সমাবেশ (Rodshaped বা helical symmetry)

নাম থেকেই বোঝা যায়, এদের আকার দণ্ডের মতো, তবে নানা দৈর্ঘ্যের হতে পারে। দৈর্ঘ্য Alfalfa mosaic ৪২ nm, Tobacco mosaic ৩০০ nm এবং Beet yellow mosaic ১২০০ nm। এদের নিউক্লিক এসিড কোর সর্পিলাকার (spiral) বা স্প্রিং এর মতো এবং কোর বেষ্টন করে রয়েছে একটি বেলনাকার (cylindrical) ক্যাপসিড। উচ্চ বিশ্লেষণক্ষম (high resolution) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা গেছে প্রোটিন উপএককসমূহ কোরকে বেষ্টন করে একটি সর্পিল রেখায় (helical line) একের পর এক সজ্জিত হয়ে এ ক্যাপসিড তৈরি হয়েছে (চিত্র ৩.১)। তাই এর বিন্যাসকে বলা হয় সর্পিল সমাবেশ। অধিকাংশ উদ্ভিদভাইরাস ও কিছু প্রাণিভাইরাস এ ধরনের। দণ্ডাকার ভাইরাস হতে পারে প্রাবৃত (enveloped) ও অনাবৃত (naked)।

১.১. দণ্ডাকার অনাবৃত (rod shaped naked)—এ ভাইরাসে প্রোটিন ক্যাপসিডকে বেষ্টন করে কোনো আবরণ থাকে না। দণ্ডের নম্যতা, ঋজুতা ও দৈর্ঘ্য ভেদে এরা হতে পারে বেসিলাস আকার (bacillus shaped) ও সূত্রাকার (filamentous) (চিত্র ৩.৩ক)।

১.১.১. বেসিলাস আকার (bacillus shaped) **ভাইরাস**—এরা শক্ত, অনম্য (non-flexible), ঋজু (straight) এবং অপেক্ষাকৃত খর্বাকার (short) কণা; যথা—Alfalfa mosaic (৫৮ × ১৮ nm), Tobacco mosaic (৩০০ × ১৮ nm) ইত্যাদি (চিত্র ৩.১ ক)।

১.১.২. সূত্রাকার (filamentous) **ভাইরাস**—এরা দীর্ঘ, দণ্ডাকার ও নম্য (flexible) কণা। যথা—Potato X ভাইরাস (৫৩২ × ১৩ nm), Clover white mosaic (৫৮০ × ১৫ nm), fd phage (৮০০ × ৫ nm), Beet yellows (১৯০০ × ১০ nm) ইত্যাদি (চিত্র ৩.১ খ)।

পাদটীকা : ভাইরাসতত্ত্বে ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক µm (মাইক্রোমিটার) ও nm (ন্যানোমিটার) মেট্রিক একক। ১µm = ০.০০১ বা ১/১০০০ মিলিমিটার এবং ১nm = ০.০০১ µm = ১০Å (এংস্ট্রম)। বৃটিশ একক µ (মাইক্রন) = µm এবং mu (মিলিমাইক্রন) = nm.

ভাইরাসের আকারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস ছক

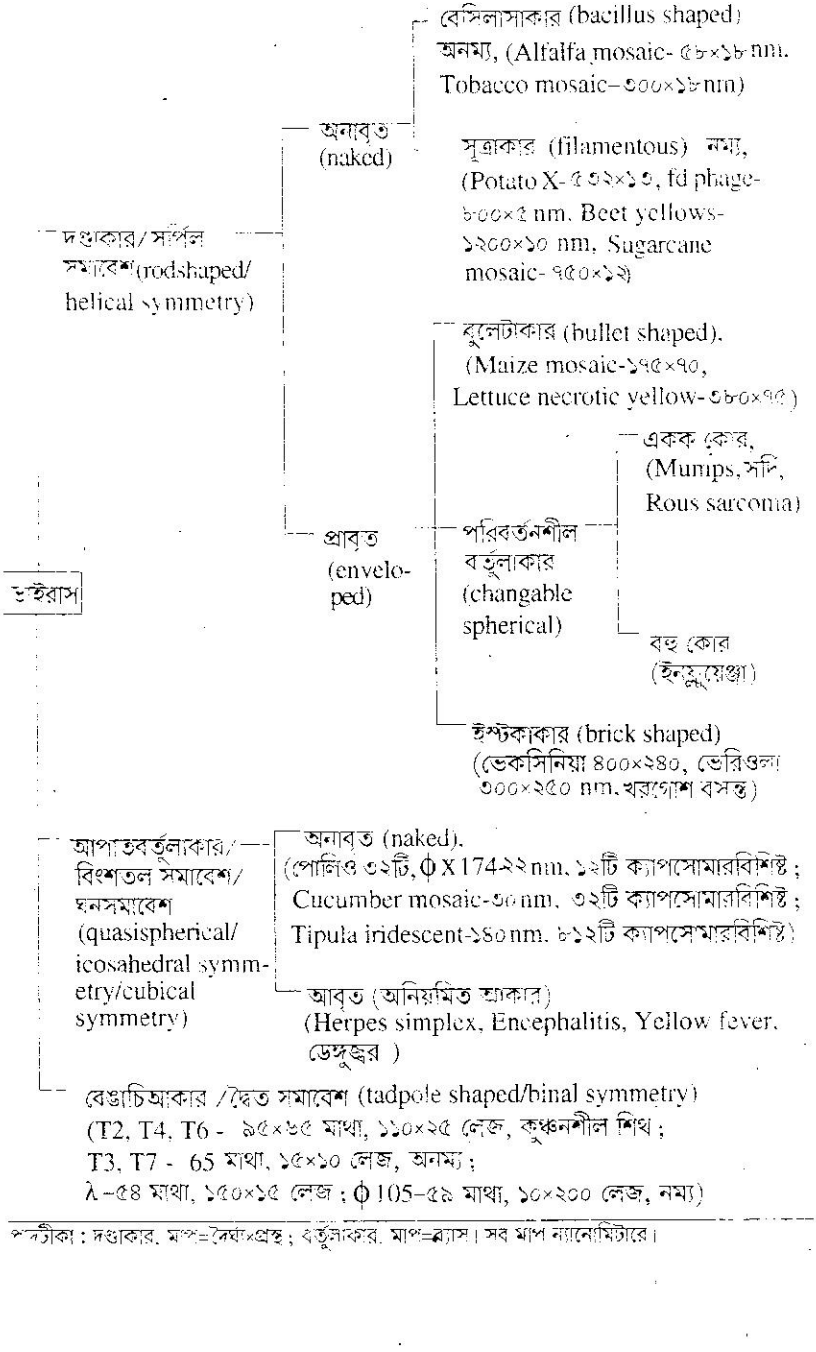

- ভাইরাস
  - দণ্ডাকার/সর্পিল সমাবেশ (rodshaped/helical symmetry)
    - অনাবৃত (naked)
      - বেসিলাসাকার (bacillus shaped) অনম্য, (Alfalfa mosaic- ৫৮×১৮ nm. Tobacco mosaic–৩০০×১৮ nm)
      - সূত্রাকার (filamentous) নম্য, (Potato X- ৫৩২×১৩, fd phage- ৮০০×৫ nm. Beet yellows- ১২০০×১০ nm. Sugarcane mosaic- ৭৫০×১২)
    - প্রাবৃত (envelo-ped)
      - বুলেটাকার (bullet shaped). (Maize mosaic-১৭৫×৭০, Lettuce necrotic yellow-৩৮০×৭৫)
      - পরিবর্তনশীল বর্তুলাকার (changable spherical)
        - একক কোর, (Mumps, সর্দি, Rous sarcoma)
        - বহু কোর (ইনফ্লুয়েঞ্জা)
      - ইস্টকাকার (brick shaped) (ভেকসিনিয়া ৪০০×২৪০, ভেরিওলা ৩০০×২৫০ nm. খরগোশ বসন্ত)
  - আপাতবর্তুলাকার/বিংশতল সমাবেশ/ঘনসমাবেশ (quasispherical/icosahedral symmetry/cubical symmetry)
    - অনাবৃত (naked). (পোলিও ৩২টি, ϕ X 174-২২ nm. ১২টি ক্যাপসোমারবিশিষ্ট ; Cucumber mosaic-৩০ nm. ৩২টি ক্যাপসোমারবিশিষ্ট ; Tipula iridescent-১৪০ nm. ৮১২টি ক্যাপসোমারবিশিষ্ট)
    - আবৃত (অনিয়মিত আকার) (Herpes simplex, Encephalitis, Yellow fever, ডেঙ্গুজ্বর)
  - বেঙাচিআকার /দ্বৈত সমাবেশ (tadpole shaped/binal symmetry) (T2, T4, T6 - ৯৫×৬৫ মাথা, ১১০×২৫ লেজ, কুঞ্চনশীল শিখ ; T3, T7 - 65 মাথা, ১৫×১০ লেজ, অনম্য ; λ –৫৪ মাথা, ১৫০×১৫ লেজ ; ϕ 105–৫৯ মাথা, ১০×২০০ লেজ, নম্য)

পাদটীকা : দণ্ডাকার, মাপ=দৈর্ঘ্য×প্রস্থ ; বর্তুলাকার, মাপ=ব্যাস। সব মাপ ন্যানোমিটারে।

সারণি ৩.১ : সর্পিল ক্যাপসিড ভাইরাসের গঠন, মাপ (দৈর্ঘ্য×ব্যাস nm) ও কয়েকটি সুদৃষ্ট (common) উদাহরণ

সাধারণ আকার অনাবৃত/প্রাবৃত	ভাইরাস (পোষক)	ক্যাপসিড, দৈ ×ব্যা অনাবৃত/প্রাবৃত	নিউক্লিক এসিড
সূত্রাকার, লম্বা, অনাবৃত	Tobacco mosaic	৩০০×১৮	১ RNA
	Potato X	৫৩২×১৩	১ RNA
	Porato Y	৭৪০×১১	১ RNA
	Clover white mosaic	৫৮০×১৫	১ RNA
	Beet yellows	১২০০×১০	১ RNA
	Sugarcane mosaic	৭৫০×১৯	১ RNA
	Turnip mosaic	৭৪০×১৯	১ RNA
	fd (*Pseudomonas*)	৮০০×৫	১ RNA
ব্যাসিলাসাকার, অনম্য, অনাবৃত, একাধিক কণা	Tobacco rattle	২০০×২২ এবং ৪৬–১১৪×২২ –কণা ২ প্রকার	১ RNA
	Alfalfa mosaic	৫৮,৪৮,৩৬ এবং ২৮×১৮ –কণা ৪ প্রকার	১ RNA
দণ্ডাকার, অনম্য, প্রাবৃত, বুলেটাকার	Cacao swollen shoot	(১২৫×২৮)	১ RNA
	Rabies (dog)	(১৩০–৩৮০×৫০–৯৫)	১ RNA
	Potato yellow dwarf	(১৫৫–৩৮০×৪৫–৯৫)	১ RNA
	Vesicular stomatitis (cattle)	(২০০×৬০)	১ RNA
	Lettuce necrotic yellow	(৩৮০×৭৫)	১ RNA
প্রায় বর্তুলাকার, পরিবর্তনশীল প্রাবৃত,	Mumps (human)	১০০০×১৮ (১৫০)	১ RNA
	Measles (human)	১০০০×১৮ (১৫০)	১ RNA
	Cold (human)	(৮০×১২০)	১ RNA
	Newcastle disease (fowl)	১০০০×১৮ (১৫০)	১ RNA
	Rous sarcoma (bird)	(১০০)	১ RNA
	Leukemia (cat)	(১০০)	১ RNA
	Influenza B (human)	(৮০–১২০)	১ RNA
ইস্টকাকার বা ঈষৎ ডিম্বাকার, প্রবৃত	Vaccinia (bovine)	(৪০০×২৪০×২০০)	২ DNA
	Variola (human)	(৩০০×২৫০×২০০)	২ DNA
	Pustular dermatitis (sheep)	(২৬০×১৬০)	২ DNA
	Rabbitpox	(২০০×১৬০)	২ DNA

দ্রষ্টব্য : ১ ও ২ = এক সূত্র ও দ্বিসূত্র। দৈ = দৈর্ঘ্য, ব্যা = ব্যাস। প্রাবৃত ভাইরাস কণার ব্যাস বন্ধনীতে এবং এর ক্যাপসিডের দৈর্ঘ্য×ব্যাস বন্ধনীর বাইরে দেখানো হয়েছে।

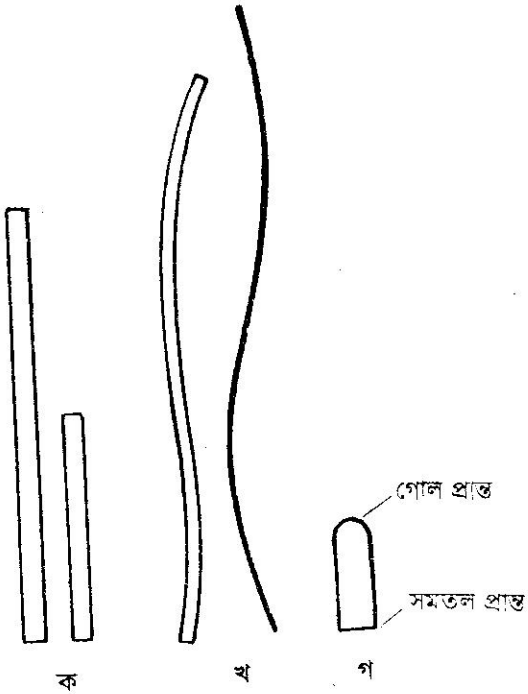

চিত্র ৩.১ : দণ্ডাকার ভাইরাস। (ক) অনম্য দণ্ডাকার, (খ) নম্য দণ্ডাকার ও (গ) বুলেটাকার।

এমন কিছু ভাইরাস রয়েছে যাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দণ্ডাকার কণারূপে দেখা যায়। যেমন—Tobacco rattle virus-এ ২০০ ও ৪৬–১১৪ nm দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ২ প্রকার দণ্ড দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে বৃহত্তর দণ্ডটিই সংক্রমণ সক্ষম পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস, ক্ষুদ্রতর দণ্ডগুলো সংক্রমণ অক্ষম, অপূর্ণাঙ্গ ভাইরাস।

১.২. দণ্ডাকার প্রাবৃত (Rod shaped enveloped) ভাইরাস—এসব দণ্ডাকার ভাইরাসের ক্যাপসিড বেষ্টন করে রয়েছে একটি অতিরিক্ত লিপোপ্রোটিন বহিরাবরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বহিরাবরণটি একটি ঢিলে ধরনের ঝিল্লীবিশেষ। এসব ক্ষেত্রে ভাইরাসের আকৃতি কিছুটা পরিবর্তনশীল (changeable) হয়। এগুলো তিন প্রকার হতে পারে, যথা— বুলেটাকার, পরিবর্তনশীল বর্তুলাকার এবং ইস্টকাকার (চিত্র ৩.২, ৩.৩)।

১.২.১. বুলেটাকার (bullet shaped) ভাইরাস—এরা অনম্য দণ্ড এবং অপেক্ষাকৃত খর্বাকার। এদের প্রাবরণ ঢিলে নয়, এদের আকার কখনও পরিবর্তিত হয় না। এদের এক প্রান্ত গোল ও অন্য প্রান্ত সমতল। র‍্যাবডো ভাইরাস এ ধরনের (চিত্র ৩.১গ, ৩.২)। যথা—

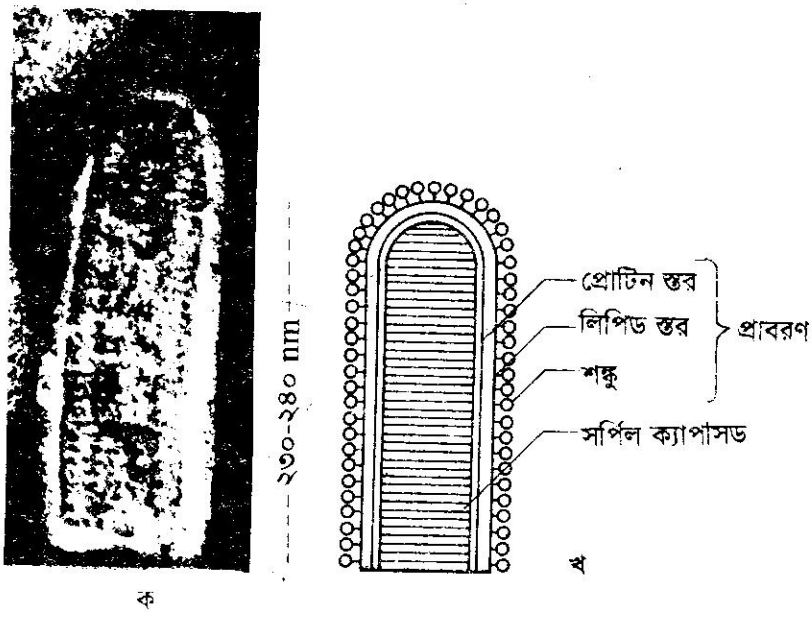

চিত্র ৩.২ : বুলেটাকার র‍্যাবডো ভাইরাস। (ক) ইলেক্ট্রনবীক্ষণিক চিত্র, (খ) ক থেকে অঙ্কিত নকশা (diagramatic) চিত্র। [Microbiology. B.D. Davis *et al.* এর সৌজন্যে।]

Vesicular stomatitis of cattle. Rabies of dog. Lettuce necrotic yellow ইত্যাদি। বিশেষ আকৃতির জন্যই এদের বুলেটাকার বলা হয়। এমন কিছু উদ্ভিদ র‍্যাবডো ভাইরাস আছে যাদের উভয় প্রান্ত গোল। যথা—Cacao swollen shoot ভাইরাস।

১.২.২. **পরিবর্তনশীল বর্তুলাকার** (spherical) **ভাইরাস**—টিলে প্রাবরণ বিশিষ্ট এসব ভাইরাস কোরের সংখ্যা ভেদে আবার দুরকম হতে পারে। যেমন—একক কোর ও বহু কোর।

১.২.২.১. **একক কোর ভাইরাস**—লিপোপ্রোটিন আবরণের মধ্যে একটি মাত্র চক্র বা কুণ্ডলাকার নিউক্লিওক্যাপসিড দ্বারা এগুলো তৈরি হয় (চিত্র ৩.৩ খ ও গ)। যেমন—মানুষের মামপস্ ও হাম (চিত্র ৩.২৩), মুরগির নিউকেসল্ রোগ, পাখির রাউস সারকোমা, ইঁদুর, বিড়াল ও গবাদির লিউকেমিয়া ইত্যাদি।

১.২.২.২. **বহু কোর ভাইরাস**—এ ধরনের ভাইরাসে আবরণের মধ্যে একাধিক নিউক্লীয় ক্যাপসিড থাকে যেমন, ফ্লু ভাইরাস। (চিত্র ৩.২৪)

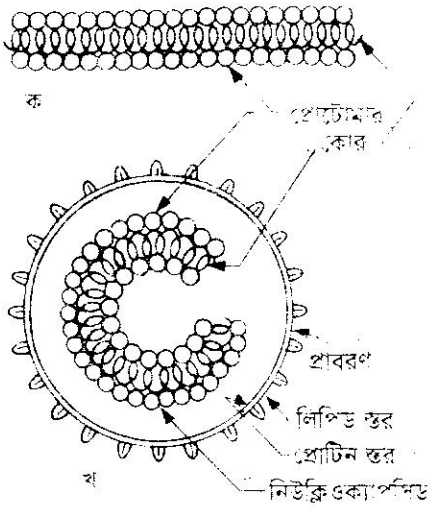

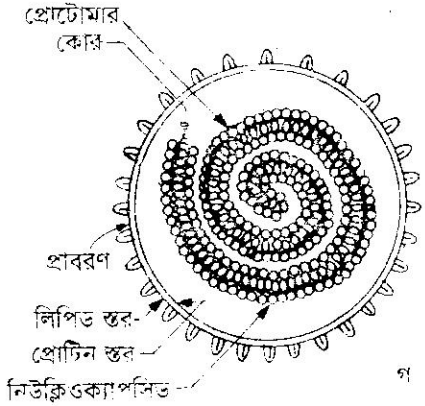

চিত্র ৩.৩ : সর্পিলাকার ক্যাপসিড ভাইরাস। (ক) সর্পিল অনাবৃত ; (খ) [illegible] চক্রাকার ক্যাপসিড ; (গ) সর্পিল প্রাবৃত কুণ্ডলাকার ক্যাপসিড।

BANSDOC Library Dhaka

সারণি ১.২ : বিংশতল ক্যাপসিড ভাইরাসের গঠন, মাপ (=ব্যাস) ও কয়েকটি সুদৃষ্ট উদাহরণ

সাধারণ আকার প্রাবৃত/অনাবৃত	ভাইরাস (পোষক)	ব্যাস (nm)	ক্যাপসোমার সংখ্যা	নিউক্লিক এসিড
	Cucumber mosaic	৩০	৩২	১ RNA রে
	Barley yellow dwarf	২৫		১ RNA রে
	Tobacco necrosis	২৮		১ RNA রে
	Rice dwarf	৭০	৯২	২ RNA রে
	Clover wound tumor	৩৫ -৪৫	৯২	১ RNA রে
বিংশতল,	Tipula iridescent	১৪০	৮১২	২ DNA
অনাবৃত,	ϕX174 কলিফাজ	২২	১২	১ DNA চ
আপাত বর্তুলাকার	f2, fr1, R17 কলিফাজ	৩২		১ RNA রে
	রিও গ্রুপ	৭০–৮০	৯২	২ RNA রে
	এডেনো গ্রুপ	৬০–৯০	১৫২	২ DNA চ
	পোলিও (মানব)	২৭	৩২	১ RNA রে
	প্যাপিলোমা (মানব)	৫৫	৭২	২ DNA চ
	পলিওমা (মুষিক)	৪৫	৭২	২ DNA চ
	Turnip yellow mosaic	২৮	৩২	১ RNA রে
	Tobacco ring spot	২৮	৩২	১ RNA রে
	Cauliflower mosaic	৫০	৭২	২ DNA চ
	Adenoassociaed	২০	১২	১ DNA চ
	Rubella (মানব)	৭০ (৩০)	১৬২	১ RNA রে
	Herpes simplex (মানব)	২০০ (১০০)	১৬২	২ DNA রে
প্রায় বর্তুলাকার,	Encephalitis (মানব)	৫০ (৩০)	৩২	১ RNA রে
প্রাবৃত,	পীতজ্বর (মানব)	৪৫ (৩০)		১ RNA রে
পরিবর্তনশীল	ডেঙ্গু (মানব)	৪৫ (৩০)		১ RNA রে

সংক্ষেপণ : ১ ও ২ = একসূত্র ও দ্বিসূত্র ; রে = রেখাকার ; চ = চক্রাকার। বন্ধনীর বাইরে প্রাবৃত ভাইরাসের এবং বন্ধনীতে নিউক্লিওক্যাপসিডের ব্যাস দেয়া হয়েছে। [ডেভিস ও অন্যান্য, লুরিয়া ও অন্যান্য, জোকলিক ও অন্যান্য এবং ফ্রিংকেল-কনরাট এর সাহায্যে সঙ্কলিত।]

১.২.৩. ইস্টকাকার ভাইরাস (brick shapd)—বিশেষ আকারের এ ভাইরাসে নিউক্লিওক্যাপসিড একটি জটিল আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। লিপিড ও প্রোটিন নির্মিত কয়েকটি স্তর দিয়ে এ আবরণ তৈরি। এদের সাধারণ আকার অনেকটা ইটের মতো, তবে

কণাগুলো গোল। ক্ষেত্রবিশেষে এদের অনেকটা ডিম্বাকারও হতে দেখা যায়। যেমন—মানব বসন্ত (Variola), গোবসন্ত (Vaccinia), মেষ বসন্ত (Pustular dermatitis of sheep), খরগোস বসন্ত (Rabbitpox), মুরগি বসন্ত বা রাণীক্ষেত রোগ (Fowlpox, চিত্র ৩.৪) ইত্যাদি।

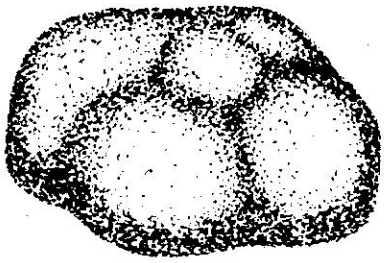

ক

খ১

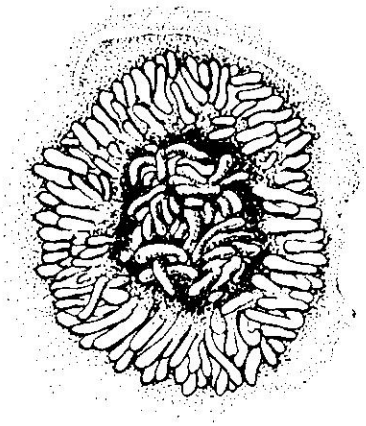

খ২

চিত্র ৩.৪ : বসন্ত ভাইরাস। (ক) পাউরুটি বা ইস্টকাকার ভাইরাসের অঙ্কিত চিত্র ; (খ) ডিম্বাকার বসন্ত ভাইরাস, খ১-ইলেক্ট্রনবীক্ষণিক চিত্র, খ২-খ১ থেকে অঙ্কিত রেখা চিত্র। [Microbiology, C.F. Norton এর সৌজন্যে।]

২. **আপাত-বর্তুলাকার বা বিংশতল সমাবেশ** (Quasi-spherical বা icosahedral symmetry) :

আপাতবর্তুলাকার বা বিংশতল সমাবেশ ভাইরাস দু'ধরনের হতে পারে। যেমন—বিংশতল অনাবৃত ও বিংশতল প্রাবৃত।

২.১. বিংশতল অনাবৃত ভাইরাস—সাধারণ পর্যবেক্ষণে এসব ভাইরাসকে বর্তুলাকার মনে হলেও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে, এরা বিশেষ গঠনের অতি ক্ষুদ্র কেলাসাকার কণা (চিত্র ৩.৫)। বিজ্ঞানী ক্লুং ও ক্যাসপারের মতে এ সকল ভাইরাসের ক্যাপসিড তৈরি হয়েছে বহু পার্শ্ববিশিষ্ট বিশেষ ধরনের প্রোটিন খোলক (shell) দ্বারা তাই এদের বহুপার্শ্ব (polyhedral) ক্যাপসিড বা বহুতলক (polyhedron) বলা হয়। বিশেষ ধরনের ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে যে, এসব বহুতলকের অধিকাংশই বিংশতলক (icosahedron)। এদের রয়েছে বিশটি পার্শ্ব (side), ত্রিশটি প্রান্ত (edge) এবং বারোটি চূড়া (vertex) বা কোণা (চিত্র ৩.৫, ৩.৬ ক)। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল গঠনের এ ক্যাপসিডকে সমমাত্রিক (isometric) ক্যাপসিডও বলা হয়। এর সাথে তুলনামূলক বিবেচনায় সর্পিল সমাবেশ ক্যাপসিডকে বলা হয় অসমমাত্রিক (anisometric) ক্যাপসিড। কণাকার (particulate) এ বিংশতল (icosahedral) ক্যাপসিডকে ঘনাকার (cubical) ক্যাপসিডও বলা হয়। পলিও, ϕX174 ও টিপুলা ইরিডিসেন্ট (Tipula iridescent) ইত্যাদি এ ধরনের ভাইরাস।

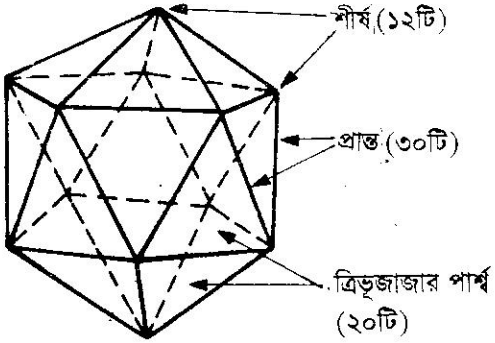

চিত্র ৩.৫ : ঘনাকার (cubical) বা বিংশতল (ecosahedral) ভাইরাস।

২.২. বিংশতল প্রাবৃত (Icosahedral enveloped) **ভাইরাস**—এসব ভাইরাসের বিংশতল ক্যাপসিড বেষ্টন করে রয়েছে কিল্লীর ন্যায় ঢিলে (loose) ধরনের একটি লিপোপ্রোটিন নির্মিত আবরণ। তাই সাধারণ পর্যবেক্ষণে এদের আকার কিছুটা অনিয়মিত ও পরিবর্তনশীল মনে হয়। বহু বিংশতল প্রাণিভাইরাস প্রাবরণবিশিষ্ট। যেমন—জলবসন্ত (Herpes simplex, চিত্র ৩.২৩), টোগা ও রেট্রো ভাইরাস (চিত্র ৩.৬ খ)।

৩. বেঙাচি আকার (Tadpole shaped) **বা দ্বৈত সমাবেশ** (binal symmetry)—নীলচে সবুজ শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া পরজীবী অনেক ভাইরাসের আকার এ ধরনের। এদের দেহ মাথা ও লেজ এ দুটি অংশে বিভক্ত। মাথা সাধারণত বিংশতল, ঘন সমাবেশ এবং লেজ দণ্ডাকার, সর্পিল সমাবেশ। তাই এদের বিন্যাসকে বলা হয় দ্বৈত সমাবেশ (binal